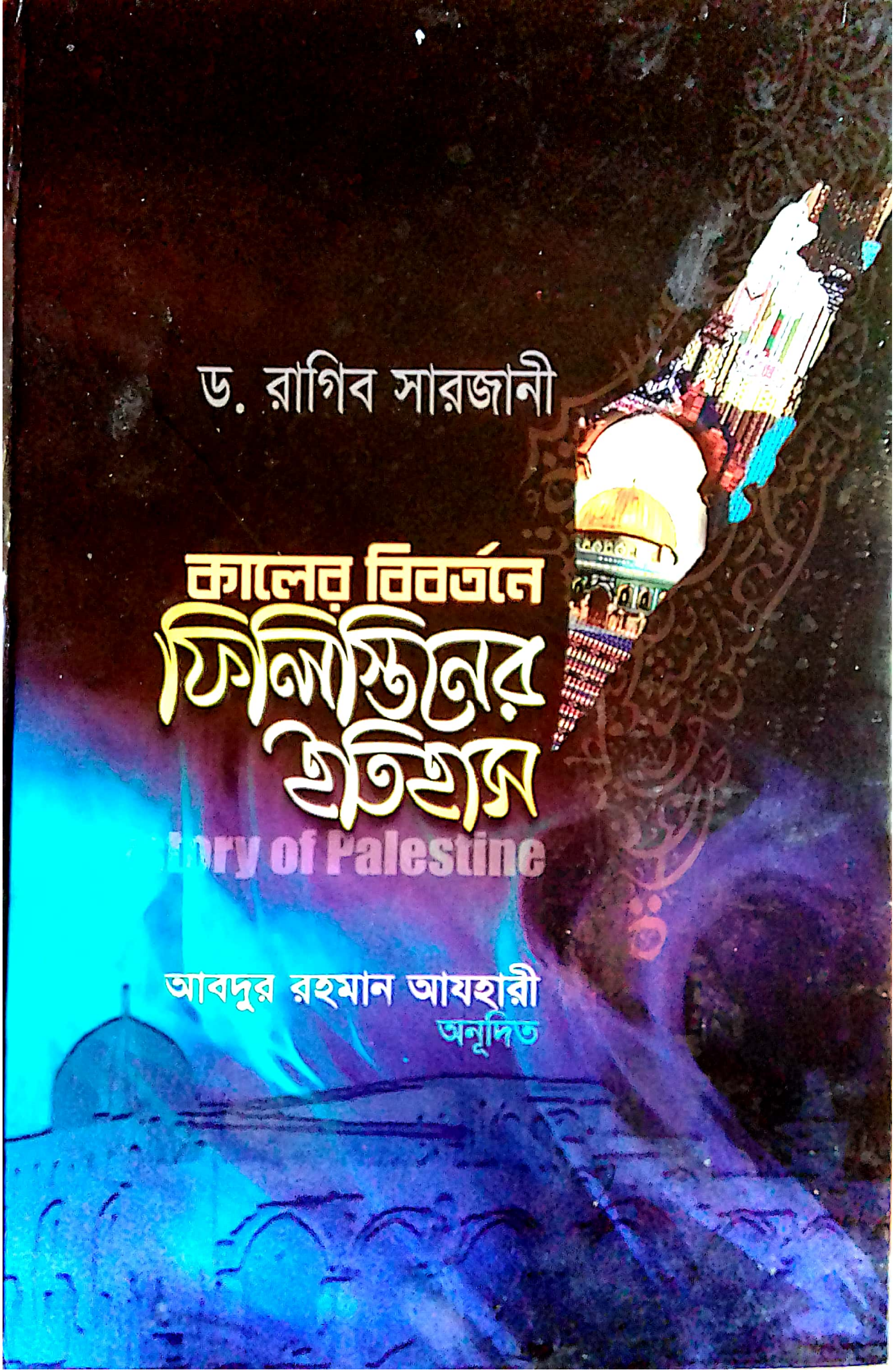

ড. রাগিব সারজানী
কালের বিবর্তনে
ফিলিস্তিনের
ইতিহাস
tory of Palestine
আবদুর রহমান আযহারী
অনূদিত

কালের বিবর্তনে
ফিলিস্তিনের ইতিহাস

[মানব ইতিহাসের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত]

মূল

ড. রাগিব সারজানী

কায়রো, মিসর

অনুবাদ

আবদুর রহমান আযহারী

শিক্ষার্থী : আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়

হিস্ট্রি এন্ড সিভিলাইজেশন ডিপার্টম্যান্ট, মিসর

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

মুহাদ্দিস, জামালুল কুরআন মাদরাসা

গেন্ডারিয়া, ঢাকা

CamScanner

কালের বিবর্তনে

ফিলিস্তিনের ইতিহাস

মূল
ড. রাগিব সারজানী
কায়রো, মিসর

ভাষান্তর
আবদুর রহমান আযহারী

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

স্বত্ব : সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশনা
১০৮ [একশত আট]

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২২

প্রকাশক
প্রচ্ছদ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩ ৬৭৫৫৫৫

প্রচ্ছদ
শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ৬০০ টাকা মাত্র

সূচি

আমাদের কথা ৭
অনুবাদকের কথা ৮
লেখকের কথা ১০
ভূমিকা ১২
ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে অধ্যয়ন কেন? ১৫
প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগে ফিলিস্তিন ২৪
মধ্য ব্রোঞ্জ যুগে ফিলিস্তিন ৩৫
ফারাও শাসকবর্গ ও বনী ইসরাইল ৪৭
তীহ প্রান্তরে বনী ইসরাইল ৬১
কি সেই তাবুত? ৬৬
ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ইহুদী সম্প্রদায় ৭৩
মসীহের জন্ম ও ইহুদী অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি ৮৩
ফিলিস্তিনের সাথে রসুল ﷺ-এর সম্পর্ক ৮৯
নববী যুগে ফিলিস্তিন ৯৩
রসুলুল্লাহর পত্র পেয়ে শুরাহবীল ইবনু আমর গাসসানীর কাণ্ড ১০৭
আবু বকর সিদ্দীক ﷺ এর যুগে ফিলিস্তিন ১১৯

CamScanner

ফিলিস্তিনে আমর ইবনু আস ﵁ ১৩০
উমারী সন্ধিপত্র ১৪১
বিনিময়ে খ্রিস্টানদের দায়িত্ব কী ছিল? ১৪৪
মুয়াবিয়াহ ইবনু আবু সুফইয়ান ﵁ ফিলিস্তিনে ১৫০
তুলুন ও ইখশীদ যুগে ফিলিস্তিন ১৬২
উবায়দিয়া (ফাতিমী) সাম্রাজ্য ১৬৯
সালজুক যুগে ফিলিস্তিন ১৭৯
ফিলিস্তিন অভিমুখে ক্রুসেডার বাহিনী ১৮৯
আল-কুদসের পথে ক্রুসেডার বাহিনী ১৯৮
ক্রুসেডারদের বাইতুল মুকাদ্দাস প্রবেশ ২০৮
ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ২১৮
নুরুদ্দীন জঙ্গী ও বাইতুল মুকাদ্দাস ২৮৮
ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর প্রচেষ্টা ২৩৮
হিত্তীন যুদ্ধ ২৪৯
সুর অবরোধ তুলে নেওয়া ও ক্রুসেডারদের নতুন ধৃষ্টতা ২৬১
বাইতুল মুকাদ্দাস পুনঃদখলে বিবিধ ক্রুসেড অভিযান ২৭২
মামলুক সাম্রাজ্য ও বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার ২৮২
ইসলামী বিশ্ব হতে ক্রুসেডারদের বিতাড়ন ২৯১
উসমানী সাম্রাজ্য ও ফিলিস্তিন সংযুক্তি ২৯৯
উসমানী খেলাফতের দুর্বলতার যুগে ফিলিস্তিন ৩০৭
সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদের শাসনামলে ফিলিস্তিন ৩১৬
সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদের পরবর্তী যুগে ফিলিস্তিন ৩২২
আতাতুর্ক, তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষতা ও ফিলিস্তিনের ইহুদীকরণ ৩৩০
ফিলিস্তিনের ইহুদীকরণে মৌলিক পাঁচ পদক্ষেপ ৩৩৩
ফিলিস্তিনে সশস্ত্র সংগ্রাম ৩৩৯
ফিলিস্তিনের ইতিহাস ঘিরে কিছু পর্যালোচনা ৩৫৪
প্রিয় ভ্রাতৃসমাজ! ৩৬৬

আমাদের কথা

মনটা ভারাক্রান্ত। ফিলিস্তিনের ইতিহাস বেশ ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। পড়লে বুঝতে পারবেন। তা ছাড়া যেই সারজানীকে চিনতাম না; এখন আমি রীতিমত তাঁর প্রেমে পড়ে গেছি। সময় থাকলে তাঁর সব বই পড়ে ফেলতাম। তবে এখনও আশা আছে।

'কিস্‌সাতু ফিলিস্তিন' সারজানীর জাদরেল একটি রচনা। অনুবাদ করেছেন নবীন অনুবাদক মাওলানা আবদুর রহমান আযহারী। নবীনের অনুবাদ হওয়ায় সম্পাদনার কাস্তেটা নির্মমভাবে চালাতে হয়েছে। তবে এখন অনুবাদটাও আরবী মূলের মত সুখপাঠ্য হয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবে নম্বর প্রদানের মূল দায়িত্ব পাঠকের।

আমরা নাম দিলাম 'কালের বিবর্তনে ফিলিস্তিনের ইতিহাস'। সংক্ষিপ্ত হলেও লেখক টাচ করেছেন পুরো দুনিয়ার ইতিহাসে। বিশেষত ফিলিস্তিন-সংশ্লিষ্ট ইতিহাসে স্পর্শ করতে লেখক কখনও ভোলেননি। আর কাহিনীর পরম্পরা তিনি বজায় রেখেছেন একেবারে উপন্যাসের কায়দায়, যা আপনাকে তীব্রভাবে বিস্মিত করবে।

মুসলমানদের হৃদয়ে ফিলিস্তিন ঘিরে এক বিশেষ আবেদন সৃষ্টির লক্ষে লেখক এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। মূল আরবী গ্রন্থ এই আবেদন সৃষ্টিতে যথাযথভাবে সফল। অনুবাদও যদি অনুরূপ সফল হয়, তা হলে আমাদের শ্রম সার্থক।

আল্লাহ ﷻ লেখক, অনুবাদ, সম্পাদক ও পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে স্বাধীন ফিলিস্তিন দেখে যাওয়ার এবং মৃত্যুর আগে মসজিদে আকসায় সালাত আদায়ের তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আবদুল আলীম
সম্পাদক ও মহাপরিচালক
হুদহুদ প্রকাশন

অনুবাদকের কথা

২০২০ সালের শুরু। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পড়তে আসার তখনও বছর পোরেনি। করোনা ভাইরাসের আক্রমণে তখন সারা দুনিয়া নাকাল। মিসরে চলছে লকডাউন। আল-আযহার বন্ধ অনির্দিষ্টকালের জন্য। বাসায় অবস্থানের বিকল্প কিছু নেই। তখন প্রখ্যাত দাঈ ও ইতিহাসবিদ ডক্টর রাগিব সারজানীর বইগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম। ফিলিস্তিন নিয়ে তাঁর লেখা পাঁচটি বই পড়ে ফেলি। সেগুলোর মধ্যে 'কিস্‌সাতু ফিলিস্তিন' বইটি আমাকে খুব আলোড়িত করে। ইতিহাসের সাথে দাওয়াত ও চেতনার এক অপূর্ব মিশ্রণ। আল-আকসার পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের এ আবেদন বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর তীব্র প্রয়োজন অনুভূত হয়। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি বইটি এখনও বাংলায় অনূদিত হয়নি।

পুরো কায়রো শহরে তখন রামাদানের আমেজ। সিদ্ধান্ত নিই এবারের রামাদান কাটবে ফিলিস্তিনের সাথে। শুরু হয় অনুবাদ। তারাবীহের পর লেপটপের সামনে বসি। নিস্তব্ধ রাতে অনুবাদে ডুবে থাকি সাহরী পর্যন্ত। ফজরের পর যোহর পর্যন্ত বিশ্রাম। তারপর মাগরিব পর্যন্ত ফিলিস্তিনকে বাংলায় রূপান্তর। অনুবাদ মানে একদম অনুবাদে হারিয়ে যাওয়া। মাঝে মাঝে আবেগে কেঁপে উঠি। কখনও কখনও আল-আযহারের ফিলিস্তিনী বন্ধুদের সাথে মতবিনিময় করি। পহেলা রামাদান থেকে ঈদের রাত পর্যন্ত এভাবে কেটে যায়। অনুবাদ সম্পন্ন হয় প্রায় দুই তৃতীয়াংশের। বলতে পারি, এটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ রামাদান।

এর মধ্যে আল-আযহারের বার্ষিক পরীক্ষার তারিখ হয়ে যায়। খুব কষ্টে ফিলিস্তিন থেকে সরে এসে পরীক্ষায় মনোনিবেশ করি। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাশাপাশি কয়েকটি আরবী ম্যাগাজিনে লেখালেখিতে জড়িয়ে পড়ি। তখন বড় ইতিহাস গ্রন্থেরও

অনুবাদ চলছিল। সব মিলিয়ে ফিলিস্তিনের ইতিহাসে ফিরে আসতে আসতে ফুরিয়ে যায় প্রায় দেড় বছর। অবশেষে আল্লাহ ﷻ-র মেহেরবানীতে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে সম্পন্ন হয় 'কিস্‌সাতু ফিলিস্তিনে'র অনুবাদ।

একাধিক প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানের সাথে অনুবাদটি প্রকাশের কথা হয়। শেষে হুদহুদ প্রকাশনের মুহাম্মাদ দিলাওয়ার হোসাইন সাহেবের আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করে। হুদহুদ পরিবার অনুবাদ সম্পাদনার ক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। তাঁদের এই ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না। এখন বইটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

মাসিক আল-হামিদ সম্পাদক মাওলানা আহমাদুল্লাহ ও প্রিয় ভগ্নিপতি, জাতীয় লেখক পরিষদের সেক্রেটারি আবদুল গফফার সাহেবসহ যাদের নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণায় হাতে কলম তুলে নেওয়ার হিম্মত হয়েছে, তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আশা করি ফিলিস্তিনের ইতিহাস মুসলমানদের হৃদয়ে জায়গা করে নিবে। ফিলিস্তিনের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ আরও গভীরে প্রোথিত হবে। আল্লাহ ﷻ বইটি কবুল করুন। আমীন।

আবদুর রহমান
নসর সিটি, কায়রো, মিসর
তারিখ: ০১/০৬/২০২২

CamScanner

লেখকের কথা

ইসলামী ইতিহাসের হাজারও কাহিনী থেকে আমরা আপনাদের জন্য নির্বাচন করেছি এমন এক বিশেষ কাহিনী, বর্তমান যুগে যা অধ্যয়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি। তা হল ফিলিস্তিনের কাহিনী। ফিলিস্তিনের কাহিনী মানবেতিহাসের এমন এক অধ্যায়, যা অধ্যয়ন ও আত্মস্থ করা মুসলমানদের আবশ্যক। এতে রয়েছে অসংখ্য দৃষ্টান্ত আর উপদেশ। রয়েছে এমন অজস্র শিক্ষা, যা থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি এখন, এবং নিকট ও দূরবর্তী ভবিষ্যতে।

কেউ কেউ মনে করেন, ফিলিস্তিন ইস্যু একটি ভূখণ্ডগত বিষয়; যা এতান্তই ফিলিস্তিনীদের নিজস্ব ব্যাপার। যেহেতু ফিলিস্তিনীরা প্রতিনিয়ত নানাবিধ ঘটনার সম্মুখীন হন, তাই এই অধ্যায় নিয়ে পড়াশোনা তাদেরই প্রধান কর্তব্য।

হে মুসলিম ভ্রাতৃবর্গ! ফিলিস্তিন ইস্যু একটি সর্বব্যাপী ইসলামী ইস্যু। এমন এক ইস্যু যা প্রত্যেক মুসলমানকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছে। কেননা, ফিলিস্তিন ইস্যু প্রথমত আকিদার ইস্যু। আর আকিদাসংক্রান্ত বিষয় এমন, যা পূরণ না করে কোনো মুসলমান জীবনযাপন করতে পারে না। অতএব, ফিলিস্তিন প্রত্যেক ওই মুসলিমের ইস্যু, যে নিজের ধর্মের উপর শ্রদ্ধাশীল, আমাদের রব তাঁর কিতাবে যা বলেছেন, তার উপর শ্রদ্ধাশীল, আমাদের হাবীব ﷺ হাদীসে যা বলেছেন, তার ওপর শ্রদ্ধাশীল, ইতিহাসের ধাপে ধাপে এই উম্মতের সন্তান উলামা-সুলাহা ও মুজাহিদরা যা করেছেন, তার উপর শ্রদ্ধাশীল।

বিভিন্ন দলিলের আলোকে প্রমাণিত যে, এই ভূখণ্ড পবিত্র। এটা মুসলমানদের প্রথম কেবলা এবং তৃতীয় হারাম। এখানে রয়েছে মসজিদে আকসা। এটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ যে, হাদীসের ভাষ্যমতে মক্কার মসজিদে হারাম, মদীনার মসজিদে নববী এবং ফিলিস্তিনের এই মসজিদ বাদে আর কোনো মসজিদের উদ্দেশে সফর করা যাবে না। ফিলিস্তিনের ভূমি কুরআনের একাধিক বিবরণমতে বরকতময় অঞ্চল।

ফিলিস্তিনের কাহিনী নির্বাচনের অন্যতম আরেক কারণ, ফিলিস্তিনের কাহিনীর আলোকে আমরা অধ্যয়ন করব পুরো ইসলামী ইতিহাস। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের প্রতিটি ধাপ এই ভূখণ্ড দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। রসুল ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে ইসলামের আলোকে শাসনকারী প্রতিটি সাম্রাজ্য এই ভূখণ্ড হয়ে অতিবাহিত হয়েছে। ফিলিস্তিনের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে আমরা বিচরণ করব মানবেতিহাসের প্রতিটি পরতে পরতে। শুধু ইসলামী ইতিহাসই নয়, বরং ফিলিস্তিনের ইতিহাস থেকে আমরা জেনে নেব পারসিক, রোমান, অ্যাসিরিয়ান, ব্যাবিলন ও ফারাওদের ইতিহাস। এমনইভাবে ফিলিস্তিনের ইতিহাস ধরে আমরা বিচরণ করব আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসেও। ঘাঁটাঘাঁটি করব ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানিসহ বহু আধুনিক রাষ্ট্রের ইতিহাস।

এই বরকতময় রাষ্ট্রের ইতিহাসে দুনিয়ার যে রাষ্ট্রেরই রয়েছে কোনো না কোনো সম্পর্ক কিংবা কোনো প্রকারের রেষারেষি, সেগুলোর ইতিহাসও আমরা জেনে নেব।

সেই সাথে আমরা আলোচনা করব চলমান ফিলিস্তিন সংকট নিয়েও। কেননা, ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে এত অধিক পরিমাণে অপপ্রচার চালানো হয়েছে, যা অন্য যেকোনো ইস্যু নিয়ে চালানো অপপ্রচারের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। জায়নবাদীদের দখলে রয়েছে ভয়ঙ্কর মিডিয়া শক্তি। এই মিডিয়া শক্তির ব্যবহার করে ফিলিস্তিনের ইতিহাসে ঘটানো হয়েছে এক বড় ধরণের বিকৃতি। সেই বিকৃতির ধুম্রজালে আচ্ছন্ন হয়েছে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই।

এসব বিষয় সামনে রেখেই আজ আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি এই গ্রন্থ। ফিলিস্তিনের ইতিহাসের পশ্চাতে আমাদের রয়েছে এক মহৎ উদ্দেশ্য। আল্লাহ ﷻ কবুল করুন।

— রাগিব সারজানি

CamScanner

ভূমিকা

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের অতিগুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আলোচনার প্রত্যাশায় কালের বিবর্তন নিয়ে এ গ্রন্থটির রচনা। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস অতিদীর্ঘ এবং অত্যন্ত মহিমান্বিত। মূল্যবান রত্ন, অফুরন্ত ধন-সম্পদ ও অঢেল খনিজে পরিপূর্ণ এ ইতিহাস, যার বিস্ময় কখনও শেষ হওয়ার নয়।

ইসলামী ইতিহাসের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্য থেকে আমি আপনাদের জন্য এমন একটি কাহিনী নির্বাচন করেছি, বর্তমান যুগে যা অধ্যয়ন করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক। তা হল ফিলিস্তিনের কাহিনী। আমি মনে করি, ফিলিস্তিনের কাহিনী ইতিহাসের এমন একটি অধ্যায়, যা অধ্যয়ন না করে মুসলমানদের কোনো গত্যন্তর নেই। ফিলিস্তিনের ইতিহাসের প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে অসংখ্য উপদেশ ও দিকনির্দেশনা। রয়েছে এমন সব শিক্ষা যা থেকে আমরা পাথেয় পেতে পারি। উপকৃত হতে পারি এখন এবং নিকট ও দূরবর্তী ভবিষ্যতে।

আগেই বলে রাখি, কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, আমরা ইতিহাস পড়ব কেন? উত্তরে আমি বলব, ইতিহাস পাঠের সরাসরি নির্দেশ এসেছে আমাদের রব ﷻ-এর পক্ষ থেকে।

তিনি বলেন—

> আমি ইচ্ছে করলে এর দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দিতে পারতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তার অবস্থা কুকুরের মত; তার উপর তুমি বোঝা চাপালেও সে হাঁপায়, বোঝা না চাপালেও সে হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শন অস্বীকার করে, তার অবস্থাও এরকম, তুমি কাহিনী বর্ণনা করো; যাতে তারা চিন্তা করে। [সুরা আরাফ : ১৭৬]

এই আয়াতে রয়েছে আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ হতে সরাসরি নির্দেশ, যেন আমরা ইতিহাস অধ্যয়ন করি, কাহিনী বর্ণনা করি।

তা ছাড়া ইতিহাস পুনরাবৃত্তিশীল। যে ঘটনা ঘটেছিল এক বছর, দুই বছর, তিন বছর, দশ বছর কিংবা দশ হাজার বছর আগে, আজ আবার তা ঘটছে। কেননা, দুনিয়াতে আল্লাহ ﷻ-র এক অমোঘ নীতি রয়েছে, যা কখনও পরিবর্তন হয় না।

আল্লাহ ﷻ তাঁর মহান গ্রন্থে বলেন–

> ... দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য আর কুচক্রের কারণে। কুচক্র কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে। তারা কেবল পূর্ববর্তীদের দশারই অপেক্ষা করছে। অতএব, তুমি আল্লাহর বিধানে পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোন রকম ব্যতিক্রমও পাবে না। [ফাতির : ৪৩]

মুসলমানরা একই ভুলে নিপতিত হয় বারংবার। কেননা, তারা ইতিহাস অধ্যয়ন করে না। যেমন, একজন ডাক্তার যদি চান কোনো রোগীর সঠিক চিকিৎসা করতে, তবে তার জন্য রোগীর ইতিহাস জেনে নেওয়া আবশ্যক। গত বছর তার কী সমস্যা হয়েছিল? দশ বছর আগে তার কী ঘটেছিল? সে কোথায় কোন পরিবেশে বসবাস করেছে? কোথায় কোথায় গিয়েছে? সেই প্রতিক্রিয়াগুলো কী, যেগুলোর সম্মুখীন হয়ে সে অতীতে কষ্টভোগ করেছে এবং বর্তমানেও কষ্টভোগ করছে? এগুলো ডাক্তারকে আগে জেনে নিতে হবে; যাতে তিনি পরিশেষে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারেন।

বর্তমান ফিলিস্তিন নানান সমস্যায় জর্জরিত। এই ভূখণ্ডে প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে অসংখ্য ঘটনা। মিডিয়া সেগুলো প্রচার করছে।

হে প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

ফিলিস্তিনে যা ঘটছে, তার সমাধান রয়েছে আল্লাহ ﷻ-র কিতাবে এবং প্রিয় নবী ﷺ-এর হাদীসে। সাধারণ ইতিহাস, ফিলিস্তিনের ইতিহাস এবং সমকালীন ও পূর্ববর্তী সকল জতিসত্তার ইতিহাসের প্রতিটি পরতে পরতে আমরা পাব অসংখ্য দিকনির্দেশনা। কখনও কখনও আমি ইশারা করব ওইসব সমস্যা সমাধানের উপায়ের প্রতি, মুসলমানরা ফিলিস্তিন ও অন্যান্য স্থানে এখন যেগুলোর সম্মুখীন হচ্ছে।

CamScanner

কিছু মানুষের ধারণা, ফিলিস্তিন ইস্যু একটি আঞ্চলিক ইস্যু এবং আমার একথাগুলো তাদের জন্যই প্রযোজ্য। এটা মেনে নিচ্ছি যে, এই ইস্যু নিয়ে অধ্যয়ন তাদেরই প্রথম কর্তব্য। কেননা, তারাই প্রতিনিয়ত নানান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এটা একটা সর্বব্যাপী বিষয়। এমন বিষয়, যা প্রত্যেক মুসলিমকে বিচলিত করে রেখেছে।

একটি ঘটনা মনে পড়ছে। আমি একবার আলেকজান্দ্রিয়া শহরে একটি বিশেষ সভায় আলোচনায় অংশ নিয়েছিলাম। সেখানে আমি 'ফিলিস্তিন সংকট ও ফিলিস্তিন সংকটে মুসলমানদের করণীয়' সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন এক ভদ্র মহিলা আমার কাছে খুব শক্ত ভাষায় একটি চিরকুট লিখে পাঠান। তাতে তিনি লিখেছিলেন, আমরা ফিলিস্তিন নিয়ে আলোচনা করব কেন; অথচ মিসরে আমরাই এমন কত ধরণের সমস্যার সম্মুখীন, যেগুলো নিয়ে আলোচনা করা আমাদের কর্তব্য। তখন উত্তরে আমি তাকে বলেছিলাম– ফিলিস্তিন সংকট কি মিসর ও মিসরের বাইরে সমস্ত মুসলমানের সংকট নয়?

তখন বেশ বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল!

আসলে অনেক মুসলমানই ফিলিস্তিন সংকটকে মুসলমানদের সংকট বলে মনে করেন না। তারা একে শুধু ফিলিস্তিনীদের সংকট বলে মনে করেন। এটা এমন এক সমস্যা, যা আমাদের কাছে পুনর্মূল্যায়নের দাবি রাখে। আসলে ফিলিস্তিন প্রত্যেক ওই মুসলিমের সমস্যা, যে নিজের ধর্মের উপর শ্রদ্ধাশীল, আমাদের রব তাঁর কিতাবে যা বলেছেন, তার উপর শ্রদ্ধাশীল, আমাদের হাবীব ﷺ হাদীসে যা বলেছেন, তার উপর শ্রদ্ধাশীল, ইতিহাসের ধাপে ধাপে এই উম্মতের সন্তান উলামা-সুলাহা ও মুজাহিদরা যা করেছেন, তার উপর শ্রদ্ধাশীল।

ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে অধ্যয়ন কেন?

প্রথম বিষয় হল, ফিলিস্তিন ইস্যু হচ্ছে আকিদার বিষয়। আর আকিদার বিষয় এমন, যা ছাড়া মুসলমান বেঁচে থাকতে পারে না। ইহুদীরা কেন বলে যে, ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড তাদের? কারণ, এটা আকিদা-বিশ্বাসের ইস্যু। কেন ইহুদীরা ফিলিস্তিনের ভূমি আঁকড়ে ধরে আছে? কেন তারা এর বিকল্প মানতে রাজি নয়? এজন্য যে, তারা বলে– আমাদের তাওরাতে এমন নির্দেশই রয়েছে।

অথচ তাওরাত বিকৃত গ্রন্থ। তাতে রয়েছে বহু বিভ্রান্তি। এতদসত্ত্বেও তারা তাদের কথা অনুসারে নিজেদের হক খামচে ধরে আছে। কাজেই ফিলিস্তিন হচ্ছে আকিদার ইস্যু। আমরাও এমনই বলি। আমাদের মতেও এটা আমাদের আকিদাগত বিষয়। কাজেই এটা আকিদার মোকাবেলায় আকিদার ব্যাপার। একদিকে বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদা– যার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ সমস্ত ধর্মের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন– অপরদিকে বিকৃত আকিদা। আর মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই জানে যে, তাওরাত মুসা ﷺ-এর পর বিকৃত হয়ে গেছে। এমনইভাবে ইঞ্জিলও ঈসা ﷺ-এর পর বিকৃত হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে রচিত গ্রন্থ অসংখ্য।

তবে আমরা বলি– দলিল-প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তির আলোকে ফিলিস্তিন ইসলামী আকিদার বিষয়। এটা আমাদের কোনো অস্পষ্ট অমূলক দাবি নয়। আমাদের কাছে রয়েছে এমনসব দলিল-প্রমাণ, যেগুলো প্রমাণ করে যে, এটা বিশুদ্ধ ও অভ্রান্ত আকিদা।

আমাদের আকিদায় আছে, দুনিয়ার যেকোনো ভূখণ্ড যখন একবার ইসলামের আলোকে শাসিত হয়, তখন সেটা ইসলামী ভূখণ্ডে পরিণত হয়। চাই শাসনকাল সামান্য হোক। ফিলিস্তিন ইসলামের আলোকে

শাসিত হয়ে আসছে ষোল হিজরী সন থেকে। অর্থাৎ ইসলামের সূচনাকাল থেকে। কাজেই ফিলিস্তিন প্রায় চৌদ্দশ বছরেরও অধিক সময় থেকে ইসলামী ভূমি ভূখণ্ড। কিয়ামত পর্যন্ত এই ভূখণ্ড আমাদের শরীয়ত ও আকিদায় ইসলামী ভূখণ্ড হিসাবেই বিবেচিত হবে। যদিও তা কখনও কখনও ব্রিটিশ, ফরাসী অথবা ইহুদী কর্তৃক শাসিত হোক, কিংবা শাসিত হোক দুনিয়ার অন্যকোনো সাম্রাজ্যের হাতে। এবং যদিও তা কখনও কোনো কালে মুসলমানদের হাত থেকে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক। কিন্তু তখন তা ইসলামের নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব। এটাই আমাদের আকিদা এবং এটাই আমাদের শরীয়ত। 'আল্লাহর কালিমায় কোনো পরিবর্তন নেই।'

ইসলামী ফিকহের ভাষ্যমতে, যদি কোনো ইসলামী দেশ থেকে একজন মুসলিম নারী কাফেরদের হাতে বন্দী হয়, তা হলে সেই দেশের উপর তাকে মুক্ত করে আনা ফরজ হয়ে যায়। যদি সেই দেশ তাকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়, তা হলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর উপর তাকে মুক্ত করে আনা ওয়াজিব। যদি তারাও ব্যর্থ হয়, তা হলে প্রথমে নিকটবর্তিতার ভিত্তিতে এবং এক পর্যায়ে বিশ্বের সমস্ত মুসলমানের উপর এ দায়িত্ব বর্তায়।

শুধু একজন মুসলিম নারী বন্দী হলে এই মাসআলা। এই বিধান ইসলামী ফিকহের গ্রন্থাবলিতে বিদ্যমান রয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহর সমস্ত আলেম এখানে একমত। ইসলামের ইতিহাসে এমন কোনো মাযহাব পাওয়া যায় না, যা এই মাসআলায় দ্বিমত পোষণ করেছে। তা হলে আপনি সেই পূর্ণ জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে কী বলবেন, প্রতিনিয়ত যাদের ইজ্জত লুণ্ঠন করা হচ্ছে, ঘরদোর তছনছ করা হচ্ছে, ধন-সম্পদ ছিনতাই করা হচ্ছে। তাও আবার এই তাণ্ডব এক-দুই বছর নয়; বরং চলছে যুগের পর যুগ।

ফিলিস্তিনের এই সংকট মুসলমানদেরকে বিব্রত করা বাঞ্ছনীয়। এটা দীনের অংশ। ফিলিস্তিনের মত যেকোন ভূখণ্ড অথবা আগ্রাসনের শিকার যেকোনো অঞ্চল– চাই তা ফিলিস্তিন, ইরাক, চেচনিয়া,

কাশ্মীর কিংবা দুনিয়ার যেকোনো মুসলিম ভূখণ্ড হোক– তা উদ্ধারের বিষয়ে সিথিলতা দেখায়, তা হলে দীনের এই অংশ হারিয়ে যাবে।

ফিলিস্তিনের বিষয়টি সবকিছুর উর্ধ্বে। এটা দখলকৃত সাধারণ কোনো ইসলামী ভূখণ্ড নয়, যা স্বাধীন করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব; বরং এই ভূখণ্ডে আবশ্যকতা আরও গভীরে। আরও স্পর্শকাতর। কেননা, আল্লাহ ﷻ এই ভূখণ্ডে এমন অনেক উপাদান রেখেছেন, যেগুলো প্রত্যেক মুসলমানের কাছে এই ভূখণ্ডকে পবিত্র সাব্যস্ত করেছে। নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, নিকটবর্তী-দূরবর্তী, আরব-অনারব কেউ তা অস্বীকার করে না। সব ধরণের মুসলমান বিশ্বাস করে যে, এই ভূখণ্ড পবিত্র।

আমরা সবিস্তারে প্রমাণ করব যে, এই ভূখণ্ড পবিত্র। এটা মুসলমানদের প্রথম কিবলা। মক্কা-মদীনার পর তৃতীয় পবিত্রতম স্থান। এখানে রয়েছে মসজিদে আকসা। মক্কা মুকাররামার মসজিদে হারাম ও মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববীর পর শুধু এই মসজিদে আকসার দিকেই সওয়াব ও বরকতের উদ্দেশ্যে সফর করা যায়।

কুরআন মাজীদের একাধিক স্থানে এ ভূখণ্ডকে বরকতময় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা এই ফিলিস্তিনের ইতিহাসে নিয়ে আসব এমন কিছু আয়াত, যেগুলো প্রমাণ করবে, এই ভূখণ্ড কুরআন ও হাদীসের আলোকে বরকতময় ভূখণ্ড। এ ভূমি ধন্য হয়েছে এখানে জীবন-যাপনকারী অসংখ্য সাহাবীর সোনালী পরশে; বরকতময় হয়েছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বদৌলতে; মহিমান্বিত হয়েছে অসংখ্য যুদ্ধ আর প্রলয়ঙ্কর লড়াইয়ের কারণে, যেগুলো সংঘটিত হয়েছিল ফিলিস্তিনের এই পবিত্র ভূখণ্ডে।

যেমন, আল্লাহ ﷻ ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বরকত নিশ্চিত করে দিয়েছেন। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

> আমার উম্মাতের একটি দল সবসময় দীনের পথে অটল থাকবে। তারা হবে বিজয়ী। শত্রুদের পরাস্থকারী। বিরোধিতাকারীরা তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা এই অবস্থায় অবিচল থাকবে, তাদের উপর আল্লাহর আদেশ (কিয়ামত) না আসা

পর্যন্ত। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! তারা কোথায়? নবীজী বলেন, বাইতুল মুকাদ্দাস ও তার আশপাশে।

[আহমাদ : ২২৩৭৪]

উল্লিখিত হাদীসে 'বাইতুল মুকাদ্দাস ও তার আশপাশে' বলে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূখণ্ড বোঝানো হয়েছে। এটা আমাদের প্রিয় নবী ﷺ-এর বাণী।

ইসরাইল প্রথম রাষ্ট্র যা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীন হওয়া উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান ও আযারবাইজানসহ বহু মুসলিম প্রজাতন্ত্রের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক স্থাপন করেছে। মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে অনেকগুলো ইসলামী দেশ ছিল। এ দেশগুলো জোট থেকে বের হলে ইসরাইল সবার আগে ওগুলোর সাথে বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যাতে এর অন্তরালে ইসলামী দেশগুলোকে নিজের প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসতে পারে।

ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিন দখল, আমেরিকা কর্তৃক ইরাক ও আফগানিস্তান দখলের চেয়ে কিংবা রাশিয়া কর্তৃক চেচনিয়া দখল করার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। একথা বলে আমরা অন্যান্য অঞ্চলের দখল প্রক্রিয়াকে খাট করছি না। কিন্তু ফিলিস্তিন জবরদখলের রাজনীতি অন্যান্য ইসলামী ভূখণ্ডের জবরদখলের রাজনীতির চেয়ে ভিন্ন। ভিন্নতার কারণ হচ্ছে, ইহুদী আগ্রাসন হচ্ছে বসতি স্থাপনের আগ্রাসন। এটা গণ আগ্রাসন; সামরিক আগ্রাসন নয়। এমন নয় যে, খনিজ সম্পদ দখলের জন্য তারা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে হানা দিচ্ছে, তারপর ফিরে যাচ্ছে। আগ্রাসনের ক্ষেত্রে সাধারণত যেমন হয়ে থাকে। বরং তারা সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, ব্যাবসা-বাণিজ্য, কর্ম-পেশা সবকিছু নিয়ে এসে এ ভূখণ্ডে জুড়ে বসছে। এখানেই শেষ নয়; বরং তারা দেশের মূল অধিবাসীদেরকে তাড়িয়ে করে দিচ্ছে। এজন্য ইহুদীরা ফিলিস্তিনীদের প্রত্যাবর্তনের যেকোনো দাবি প্রত্যাখ্যান করছে। কেননা, ফিলিস্তিনীদের ফিলিস্তিনে ফিরে আসার মানে হচ্ছে এখানে জনসংখ্যার অনুপাত বদলে যাওয়া; ইহুদীদের চেয়ে ফিলিস্তিনীদের জনসংখ্যা ভারী হওয়া, যা ইহুদী রাজনীতির পরিপন্থী। দুনিয়াতে যখন

এমন রাজনীতির পুনরাবৃত্তি ঘটে, তখন এমনসব পরিবর্তন সাধিত হয়, যা আমাদের ধারণারও অতীত।

কেন আমেরিকা আজ স্বস্তিতে জীবনাতিপাত করছে, অথচ ইতোপূর্বে এই ভূখণ্ড ছিল রেড ইন্ডিয়ানদের মালিকানাধীন। রেড ইন্ডিয়ানরা শত শত বছর আগ থেকে আমেরিকাতে বসবাস করে আসছিল। এমন কিছু হয় ঘটে বসতি স্থাপনের রাজনীতির কারণে। যখন আমেরিকানরা এ ভূমি জবরদখল করে নেয়, তখন তারা এখানকার মূল অধিবাসীদেরকে হত্যা করে দেয়। কালের আবর্তে তাদের স্থান পুরোপুরি দখল করে নেয় সঙ্গে আসা ইউরোপীয়ানরা। রেড ইনিয়ানদের সেই ভূমি পরিণত হয় আমেরিকায়। আর আন্দালুস পরিণত হয় স্পেন ও পর্তুগালে। এরপর মামলা ডিসমিড হয়ে যায়।

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে আমরা এমন কিছু ঘটার আশঙ্কা করছি। এজন্য এখন আমরা অধ্যয়ন করব ফিলিস্তিন ইস্যু। যাতে আমরা সবাই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারি।

ফিলিস্তিন ইস্যু নির্বাচন করার অন্যতম কারণ হচ্ছে– এ ভূখণ্ডের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে আমরা জেনে নিব ইসলামী ইতিহাস পুরোটা। আগে যেমন আমরা বলেছি, ফিলিস্তিনের কাহিনী শুরু হয়েছে ১৬ হিজরী থেকে; যখন এ পবিত্র ভূখণ্ডে মুসলমানরা প্রবেশ করেছিলেন এবং ইসলামের কল্যাণে এ অঞ্চল জয় করেছিলেন।

মুসলিম উম্মাহর সমস্ত ধাপ ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড হয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকে খোলাফায়ে রাশিদীন এবং সমস্ত সাম্রাজ্য, যেগুলো ইসলামের আলোকে শাসন করেছে।
ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে আছে উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিশেষ ইতিহাস। ফিলিস্তিনের ভূমিতে আছে আব্বাসী সাম্রাজ্যের বিশেষ ইতিহাস। ফিলিস্তিনে আছে জংগী ও আইয়ুবী সাম্রাজ্যের স্বতন্ত্র ইতিহাস। এমনইভাবে এখানে বিশেষ ইতিহাস রয়েছে সালজুক, মামলুক ও উসমানী সাম্রাজ্যের।

কাজেই আমরা যখন ফিলিস্তিনের ইস্যু অধ্যয়ন করব, তখন কেমন যেন আমরা ইসলামী ইতিহাসের প্রতিটি ধাপ ঘুরে আসব। এর চেয়েও

CamScanner

আজব কথা হচ্ছে মানব-ইতিহাসের প্রতিটি ধাপ ঘুরে আসব; শুধু ইসলামী ইতিহাস নয়। ফিলিস্তিনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে আমরা জেনে নিব পারস্যের ইতিহাস। এমনইভাবে রোমান, গ্রিক, অ্যাসিরিয়্যান, ব্যাবিলন ও ফারাওদের ইতিহাস। এমনকি আমরা জেনে নিব আধুনিক বিশ্বের ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানি প্রভৃতি দেশের ইতিহাসও। দুনিয়ার সব দেশের সাথে তার ইতিহাসের কোনো না কোনা পর্যায়ে এই বরকতময় ভূখণ্ড ফিলিস্তিনের ইতিহাসের সাথে বোঝাপড়া রয়েছে। বললাম বরকতময়, যেমন আমাদের রব ﷻ তাঁর সম্মানিত গ্রন্থে বলেছেন।

এজন্য আল্লাহ ﷻ এ ভূখণ্ডকে মুসলমানদের কাছে দামী ও মূল্যবান এমন অনেক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। যেমন, রসুল ﷺ-এর ইসরার ক্ষেত্র, মুসলমানদের প্রথম কেবলা ও ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান। এ ভূখণ্ডে অবস্থিত মসজিদে আকসায় সালাত আদায়ে রয়েছে পাঁচশত গুণ বেশি সওয়াব।

এসব কিছু কেন?

কারণ, আল্লাহ ﷻ জানেন, বিশ্বের সমস্ত শক্তি সত্বর একদিন এ ছোট্ট ভূখণ্ডের প্রতি লালায়িত হবে। অথচ এর আয়তন মাত্র ২৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার। তবে তা দুনিয়ার সব মানুষের কাছে খুব মূল্যবান। এজন্য আল্লাহ ﷻ এ ভূখণ্ডের ভালোবাসার বীজ বপন করেছেন মুমিনদের অন্তরে। যাতে যেকোনো সাম্রাজ্যের যেকোনো আগ্রাসন থেকে তারা এ ভূখণ্ডকে রক্ষা করেন।

ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে আমাদের পর্যালোচনা করতে হবে, যেকোনো বিষয়ের চেয়ে এই বিষয়ে বিকৃতির পরিমাণ অনেক বেশি। ইহুদীদের অধীনে রয়েছে ভয়ঙ্কর মিডিয়া শক্তি। এ মিডিয়া শক্তিকে পুঁজি করে ফিলিস্তিনের ইতিহাসে ঘটানো হয়েছে বিরাট বিকৃতি। এ বিকৃতির ধুম্রজাল আচ্ছন্ন করে নিয়েছে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকেই।

মনে রাখা দরকার যে, সর্ব শ্রেণির উপর প্রযোজ্য তথ্যশক্তির মালিক ইহুদীরা। যেমন সংবাদ সংস্থার কথাই ধরা যেতে। এখানে আমি আপনাদের প্রশ্ন করছি, বলুন তো, দুনিয়ার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সংবাদ

সংস্থা কোনটি? সবাই বলবেন, রয়টার্স (Reuters)। এই রয়টার্স ইহুদীদের। এসোসিটেড প্রেস (Assocated Press) ইহুদীদের। ফ্রান্সের হাভাস (Havas)-ও ইহুদীদের। এমনইভাবে দ্য টাইমস (The Times), নিউজ উইক (Newsweek), ওয়াশিংটন পোস্ট (Washington Post) ও স্টার ম্যাগাজিন (Star Magazine)-সহ বহু প্রসিদ্ধ আমেরিকান সংবাদ সংস্থার সিংহভাগ শেয়ার ইহুদীদের। এমনকি বিষয়ভিত্তিক ভ্যারায়টি (Variety) পত্রিকাটিও ইহুদীদের। নির্বাচনের দিনগুলোতে তাতে অভিনেতা-অভিনেত্রী, শিল্পী এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় যাদের হাত আছে, এমন ব্যক্তিদের অভিমত ছাপা হয়। আমেরিকার চিন্তাধারার উপর যা প্রভাব বিস্তার করে। এটি যদিও একটি বিষয়ভিত্তিক পত্রিকা তবুও আমেরিকান রাজনীতিতে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

প্রসিদ্ধ ইংরেজি পত্রিকা দ্য টাইমস-এর বেশিরভাগ মালিকানা রুপার্ট মারডক-এর। সে একজন ইহুদী। সিবিএস (CBS), সিএনএন (CNN), এবিসি (ABC), এনবিসি (NBC) ইত্যাদি দুনিয়ার প্রসিদ্ধ টেলিভিশন চ্যানেল। এসব চ্যানেলের মালিকানায় ইহুদীদের উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে। কোনো কোনোটি পুরোপুরি ইহুদীদের মালিকানাধীন। আমেরিকার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ প্রচার সংস্থার মালিকানা ইহুদীদের।

একই অবস্থা ফিল্ম নির্মাতা সংস্থাগুলোরও। যেমন, মেট্রো গোল্ডেন মেয়ার (Metro Golden Mayer) ইহুদীদের। ফক্স (Fox) (ফক্স ফিল্ম কর্পোরেশন) এবং ওয়ার্নার ব্রোস (Warner Brose)-ও ইহুদীদের।

এসব প্রযোজনা কোম্পানী যেসব ফিল্ম নির্মাণ করে, সেগুলো প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ও মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের চিন্তা-চেতনায় বিরাট প্রভাব ফেলে। ইহুদী ও মুসলিমদের ইতিহাসে এবং মানবতার ইতিহাসে যে কোনো ধরণের বিকৃতি সাধনে সক্ষম এসব কোম্পানি।

এমনকি ডিজনি (Disney) যা শিশুদের জন্য বিভিন্ন ফিল্ম নির্মাণ করে থাকে– সেটিও এ জঘন্য কর্মে জড়িত। আমি এক প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম, যা শিক্ষার সাথে বিশ্বের পরিচয়ের কাহিনীর উপর কাজ করে– যেমন, সবার আগে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছে কে? কোন দেশে শিক্ষার ধারাবাহিকতা সূচিত হয় ইত্যাদি।

CamScanner

এক পর্যায়ে ইসলামী যুগের পালা আসে। এটা এমন এক যুগ যা অস্বীকার করার কারও সাধ্য নেই। সকলেরই জানা আছে যে, হিজরী তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী তথা খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে শুধু মুসলমানরাই শিক্ষার ঝাণ্ডা বহন করেছিলেন। এই বাস্তবতা গোপন করার সাধ্য ডিজনিরও নেই। তাই ডিজনি বলতে বাধ্য হয় যে মুসলমানরাই এই ঝাণ্ডা বহন করেছিলেন। কিন্তু সে মুসলমানদের সাথে আরও একটি শব্দ জুড়ে দেয়। বলে দেয়, মুসলমান ও ইহুদীরা। ডিজনি সেখানে ইহুদীদের কিছু চিত্রও প্রদর্শন করে। যেন ইহুদীরা এ ছয় শতাব্দীকাল শিক্ষার মশাল বহন করে ঘুরে বেড়িয়েছে।

এ ছয় শতাব্দীতে ইহুদীরা আসে কোত্থেকে? আপনি হয়তো একজন ইহুদী চিকিৎসাবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী কিংবা ভূগোলবেত্তার নাম শুনতে পারেন। কিন্তু তাদের একজনের মোকাবেলায় হাজার হাজার মুসলিম ব্যক্তিত্ব পেয়ে যাবেন। কিন্তু এভাবেই ছয় শতাব্দীতে শিক্ষার মশাল বহনের কাফেলায় মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের জুড়ে দিয়ে প্রদর্শন করা হয়। আর শিশুরা তা দেখে। মুসলিম-অমুসলিম বয়স্করাও দেখে। এভাবে চোখের সামনে দিনের আলোতে ইতিহাস বিকৃত করা হয়। পুরো বিশ্ব তা দেখে, শোনে; কিন্তু রা করে না।
তাই আমরা এ বিষয়ে কলম ধরেছি। এখানে আমরা তুলে ধরব ফিলিস্তিনের প্রকৃত ইতিহাস। ফিলিস্তিন ও অন্যান্য ইস্যুকে কেন্দ্র করে যেসব বিকৃতি সাধন করা হয়েছে, সেগুলো আমরা তুলে ধরব। আমরা জেনে নিব সেই প্রোপাগান্ডা, যার ভিত্তিতে তারা ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে তাদের অগ্রাধিকার দাবি করে।

আমরা জানব তাওরাতের সেই বক্তব্যসমূহ, যেগুলো তাদেরকে ফিলিস্তিন প্রদান করে বলে তারা মনে করে। তাওরাতের কোনো কোনো বক্তব্য বিকৃত, আর কোনো কোনো বক্তব্য সঠিক। তাদের উল্লেখকৃত তাওরাতের বক্তব্যের জওয়াব আছে। সেগুলো নিয়ে পর্যালোচাও সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু সেই মিডিয়া কোথায়, যা মানুষের সামনে এই বিষয়টি তুলে ধরবে? আর যে টেম্পলের কাহিনী তারা

মিডিয়ার জোরে দুনিয়াজুড়ে গেয়ে বেড়ায়, সেই কাহিনী কি বাস্তব, না কি অবাস্তব? মুসলমানরা কোথায়, যারা এসব বিকৃতি এবং সমসাময়িক অন্যান্য বিষয়ের বিকৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবে?

কিছু কিছু মুসলমান বলে থাকেন যে, ফিলিস্তিনীরা তাদের ভূখণ্ড ইহুদীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। একথা কি আদৌ সঠিক? নাকি তা সেই মিথ্যা প্রোপাগান্ডারই অংশ যা ইহুদীরা যত্রতত্র ছড়িয়ে দিয়েছে! ইউরোপে যে হত্যাকাণ্ড ও বর্ণবাদের শিকার ইহুদীরা হয়েছিল বলে তারা প্রচার করে, তার যথার্থতা কোথায়? এসব বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার শিকার তারাও, যারা ফিলিস্তিন সংকট সমাধানে এগিয়ে এসেছিলেন। যেমন, রজার গ্যারাউডি (Roger Garaudy)-এর কথাই ধরা যাক। তিনি একজন ফরাসি মুসলিম চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। যায়নবাদের প্রতি তার তীব্র ঘৃণার জন্য তিনি বিখ্যাত। একই অবস্থা লন্ডনের মেয়রসহ প্রত্যেক সেই ব্যক্তির, যার কথায় প্রকাশ পেয়েছে যে ফিলিস্তিন ইস্যুতে তিনি মুসলমানদের পক্ষে। বিষয়টি মুসলমানদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রতিবাদের দাবি রাখে।

এসব বিষয় বিবেচনা করেই আমরা এ গ্রন্থটি রচনা করছি। ফিলিস্তিনের ইতিহাস রচনার পিছনে আমাদের উদ্দেশ্য অনেক বড়।

CamScanner

প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগে ফিলিস্তিন

আমরা আগেই বলেছি– ফিলিস্তিনের ইতিহাস অধ্যয়ন করা নিজ ধর্মের উপর আত্মমর্যাদাবোধ লালনকারী প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। আমরা আরও বলেছি যে, ফিলিস্তিন বরকতময় ভূখণ্ড। বেশ কতগুলো কারণে আল্লাহ ﷻ এ ভূখণ্ডকে বরকত দিয়েছেন। যার কিছু দৃষ্টান্ত আমরা আগে উল্লেখ করেছি। আল্লাহর তাওফীকে আরও অনেকগুলো কারণ আমরা সামনে উল্লেখ করব। আমরা বলেছি যে, এটা জাতিগত নিরাপত্তার ইস্যু; শুধু ফিলিস্তিনের নয়; বরং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর এবং পুরো মুসলিম বিশ্বের। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ইহুদী রাষ্ট্র গড়ে উঠার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করেই আমরা এসব কথা বলেছি। মুসলমানদের উচিত, এ ভূখণ্ডের প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করা। এ ভূখণ্ড স্বাধীন করা তাদের দায়িত্ব। নিজের ধর্ম ও আকিদার উপর অবিচল থাকতে চায় এমন প্রত্যেক মুসলমানের উপর এটা ওয়াজিব। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আমরা মুসলিম উম্মাহর অন্যান্য সংকটের কথা ভুলে যাব। আমি সমস্ত মানুষকে আশ্বস্ত করে বলছি যে, ফিলিস্তিন সংকটের পর্যালোচনা চেচনিয়া, কাশ্মীর, আযারবাইজান, সেউটা, মালিলা ও তুর্কিস্তানসহ ওইসব ভূখণ্ডের সংকট নিয়ে পর্যালোচনার বিকল্প নয়, যেগুলো মুসলমানদের বিভিন্ন দেশ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং মুসলমানরা আজ ওগুলোর নাম পর্যন্ত ভুলে গেছে। কোনো সন্দেহ নেই যে, এই সংকটগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ফিলিস্তিন ইস্যুর রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব– যা আমরা একটু আগে উল্লেখ করে এসেছি।

যদি আপনারা হিসাব আর গণনা করেন, তা হলে দেখবেন ২০০০ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত মাত্র আট বছরে ৫৫০০ জনেরও অধিক

শহীদের লাশ ফিলিস্তিনের মাটিতে পড়েছে। অথচ রসুল ﷺ মাত্র একটি মুসলিম প্রাণহানীর কারণে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। মোকাবেলায় পরিপূর্ণ এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন মুতার রণাঙ্গনে রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। শামের মাটিতে যখন একজন মাত্র মুসলিম নিহত হয়, তখন রসুলুল্লাহ ﷺ পূর্ণ এক বাহিনী প্রেরণ করেন। পুরো উম্মতকেই জাগিয়ে তোলেন। তা হলে আট বছরে ঝরে যাওয়া হাজার হাজার শহীদ এবং একই সময়ে লক্ষাধিক লোকের যখম হওয়া নিয়ে আপনাদের কী অভিমত? উপরন্তু প্রায় অর্ধলক্ষাধিক বাড়ি-ঘরের ব্যাপারে আপনাদের কী অভিমত, যেগুলো এই সময়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে? ধ্বংসযজ্ঞের এই সংখ্যা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত মুসলমানকে সন্ত্রস্ত করা বাঞ্ছনীয়।

এ গ্রন্থে আমাদের পন্থা একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রের উপর নির্ভরশীল। প্রথমত তা নির্ভর করবে দলিল-প্রমাণের উপর। এ গ্রন্থে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোনো কাহিনী বা বিবরণ উল্লেখ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তার উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হব। চাই সে বর্ণনা হোক প্রাচীন কিংবা আধুনিক ইতিহাস সংশ্লিষ্ট। বানোয়াট বর্ণনাগুলোকে অবশ্যই আমরা প্রত্যাখ্যান করব। যদি কোনো বিষয়ে মুসলমানদের কোনো অধিকার থাকে, তা হলে অবশ্যই আমরা তা প্রমাণ করব। যদি ইতিহাসের কোনো ধাপে ইহুদীদেরও কোনো অধিকার থাকে, তা হলে সে সত্যও আমরা তুলে ধরব। যদি এ বিষয়ে কোনো ন্যয়পরায়ণ কোনো মন্তব্য করে থাকেন, তা হলে তা আমরা অবশ্যই আলোচনা করব; এমন কি তিনি যদি অমুসলিমও হন। আমরা অযথা কাউকে দোষারোপ করব না। আমাদের মধ্যে কোনো গালাগালি নেই। নেই কোনো ভর্ৎসনা। –ভর্ৎসনাকারী, অভিশাপকারী, কটুভাষী এবং বকওয়াসকারী প্রকৃত মুমিন নয়। [তিরমিযি: ১৯৭৭]

শেষ লক্ষে পৌঁছনো পর্যন্ত আমরা দলিল-প্রমাণ দিয়ে আলোচনা করব। তবে আলোচনা হবে খুব সংক্ষিপ্ত। কেননা, আমরা এক জাতির দীর্ঘ সময়কালের ইতিহাস আলোচনা করছি, যা চৌদ্দ শতাব্দীরও অধিক। এ

CamScanner

হচ্ছে বরকতময় ভূখণ্ডের ঈমানী ইতিহাস। উপরন্তু আছে মানবতার ইতিহাস, যা আরও দীর্ঘ। কাজেই সংক্ষিপ্ত না করে উপায় নেই।

আগে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করি– প্রাক-ইসলামিক ইতিহাস অধ্যয়ন করা কি আবশ্যক?

কেউ কেউ শুধু ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়নই যথেষ্ট মনে করেন। অর্থাৎ রসুল ﷺ-এর আবির্ভাব থেকে শুরু করে বিভিন্ন খলিফা হয়ে পরবর্তী বিভিন্ন ইসলামী সাম্রাজ্যের ইতিহাস। তবে কয়েকটি কারণে আমি এই ভূখণ্ডের প্রাক-ইসলামিক ইতিহাস অধ্যায়নও জরুরী মনে করি।

প্রথমত ফিলিস্তিন একটি ইসলামী ভূখণ্ড। প্রাক-ইসলামিক ইতিহাস অধ্যয়ন আমাদের আকিদা থেকে কিছুই পরিবর্তন করবে না; তবে সেখানে প্রাচীনকালের এমন কিছু দলিল-প্রমাণ রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা ইহুদীদের কতিপয় দাবি খণ্ডন করতে পারব।

যখন আমার জানা থাকবে শুরুর ইতিহাস– ইবরাহীম ও ইয়াকুব ﷺ-এর ইতিহাস। দাউদ ও সুলাইমান ﷺ-এর ইতিহাস। সাথে সাথে এই বরকতময় ভূখণ্ডে জীবন-যাপনকারী নবীদের ইতিহাস। ওইসব অমুসলিম জাতির ইতিহাসও, যারা এ ভূখণ্ডে বসবাস করেছিল। এমনকি স্বয়ং ইহুদী ও তাদের কর্মকাণ্ডের ইতিহাসও। তখন আমি অমুসলিমদের উত্থাপিত দাবিগুলো খণ্ডন করতে পারব। চাই তা উত্থাপিত হোক ইহুদীদের পক্ষ থেকে অথবা অন্য কারও থেকে।

এখানে আমি আপনাদের কাছে একটি কাহিনী বর্ণনা করছি, যা প্রমাণ করে যে, আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি নিরেট ইসলামী ইতিহাস না-ও হয়। আদী ইবনু হাতিম ﷺ ইসলাম গ্রহণের আগে রসুল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। রসুল ﷺ জানতেন যে, এই লোক একজন খ্রিস্টান। তবে মৌলিক খ্রিস্টবাদ ত্যাগ করে তিনি রকুসিয়া নামে অন্য একটি মতবাদ গ্রহণ করেছেন, যা খৃস্টধর্মেরই একটি শাখা।

রসুল ﷺ আদী ইবনু হাতিমের সাথে আলোচনাকালে বলেন, তুমি কি রকুসী মতালম্বী নও?

আদী ইবনু হাতিম বলেন, অবশ্যই।

নবীজী ﷺ বলেন, তুমি কি তোমার গোত্রের নেতা নও?

আদি ইবনু হাতিম বলেন, অবশ্যই।

নবীজী ﷺ বলেন, তুমি কি গনীমতের সম্পদ হতে এক চতুর্থাংশ গ্রহণ কর না?[১]

আদি ইবনু হাতিম বলেন, অবশ্যই।

নবীজী ﷺ বলেন, কিন্তু তোমার ধর্মে সেটা তোমার জন্য হালাল নয়!

(পরবর্তীতে এই কাহিনী নিজ মুখে বর্ণনা করার সময়) আদী ইবনু হাতিম তায়ী ﷺ বলেন, তখন আমি বিনয়াবনত হয়ে পরলাম। অর্থাৎ আদী বুঝতে পারেন ইনি (নবীজী ﷺ) তার পুরো ইতিহাসই জানেন। ফলে তিনি স্থির হয়ে মনোযাগ দিয়ে নবীজী ﷺ-এর কথা শ্রবণ করতে থাকেন। [আহমাদ : ১৯৩৮৯]

আপনি যখন কোনো ইহুদী কিংবা অন্য কাউকে দলিল-প্রমাণ ও তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্য দিয়ে সম্বোধন করবেন। চোখে আঙ্গুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে দিবেন যে, এই ইতিহাস বিকৃত। তখন সে নত হতে বাধ্য হবে। কেননা, সে তখন বুঝতে পারবে, তার ইতিহাসের খুঁটিনাটি সবই আপনি জানেন।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ফিলিস্তিনের ইতিহাস হচ্ছে নবীদের ইতিহাস।

এখন আমি এমন একটি কথা বলব যা শুনে অনেকেই বিস্মিত হবেন। প্রিয় ভাই-বোনেরা! বনী ইসরাইলের নবীদের ব্যাপারে আমরা তাদের চেয়ে বেশি হকদার। এটা আমার কথা নয়; বরং প্রিয় নবী ﷺ-এর কথা।

---

১. সে যুগে আদীর গোত্র যখন কোনো যুদ্ধে শত্রুদের উপর বিজয়ী হয়ে গনীমত লাভ করত, তখন গোত্রের সরদার সেই গনীমতের এক চর্তুথাংশ নিয়ে নিত।

আবু মুসা ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন মদীনায় প্রবেশ করেন, তখন সেখানে কিছু সংখ্যক ইহুদীকে পান, যারা আশুরার দিনকে সম্মান করে। এ দিনে সিয়াম পালন করে। তখন নবী ﷺ বলেন, আমরা এ সিয়ামের অধিক হকদার। এরপর তিনি আশুরার দিন সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। [বুখারী : ৩৯৪২]

আমরা মুসলমানরা ইহুদীদের নবীদের ব্যাপারে তাদের চেয়েও বেশি অধিকার রাখি। কেননা, ইহুদীরা তাদের নবীদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। নবীদের জীবদ্দশায়; এমনকি মৃত্যুর পরও অসংখ্য কথা ও বিকৃতির মাধ্যমে তাদেরকে কষ্ট দিয়েছে। তাদের মহান চরিত্রে তারা লেপন করেছে বহু গর্হিত কালিমা। এভাবে তারা বেড়িয়ে গিয়েছে নবীদের প্রকৃত আদর্শ থেকে। ইহুদীরা তাদের কোনো নবীরই আনুগত্য করেনি। এমনকি তারা অনেক নবীকে হত্যাও করেছে।

পক্ষান্তরে আমরা আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত নবীকে সম্মান করি। যথার্থ শ্রদ্ধা করি এবং ভালোবাসি। তাদের মধ্যে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের নবীরাও রয়েছেন। দুনিয়ার সূচনা থেকে যত নবী আল্লাহ ﷻ প্রেরণ করেছেন তাদের সবার প্রতি রয়েছে আমাদের এ সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। একই কথা বলেছেন রসুল ﷺ ঈসা ﷺ-এর ব্যাপারে। তিনি বলেন, দুনিয়া ও আখেরাতে আমি ঈসা ইবনু মারইয়ামের সবচেয়ে বেশি আপন। [বুখারী : ৩৪৪৩]

কাজেই খ্রিস্টানদের চেয়ে মুসলমানরা ঈসা ﷺ-এর বেশি আপন। এটা আমাদের ইতিহাসের বাস্তবতা। আমাদের দীনের মর্মকথা। ইহুদীরা তাদের নবীদের ব্যাপারে যা বলে, সেকথা শুনে আমরা লজ্জিত না হয়ে পারি না। যেমন, ইয়াকুব ﷺ-এর ব্যাপারে তাদের বক্তব্য।

আপনারা কি জানেন ইয়াকুব কে?

ইয়াকুবই হচ্ছেন, ইসরাইল। অতএব, ইয়াকুবের বংশধরই হচ্ছে বনী ইসরাইল। তা সত্ত্বেও দেখুন, বনী ইসরাইল ইয়াকুব ﷺ-এর ব্যাপারে কী বলে?

তারা বলে থাকে, *ইয়াকুব তাঁর বড় ভাই ইসুর কাছ থেকে বরকত চুরি করেছিলেন।* বিকৃত তাওরাতের ভাষ্য হচ্ছে– *ইসহাক ﷺ যখন ইয়াকুবের বড় ভাই ইসুকে বরকত দিতে যাচ্ছিলেন, তখন ইয়াকুব এসে তার পথ রোধ করেন। ইসহাক ছিলেন অন্ধ। তিনি কিছু দেখতেন না। ইয়াকুব তাকে বিভিন্ন কৌশলে বোঝাতে সক্ষম হন যে, তিনিই ইসু। তখন এই ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে ইসহাক ﷺ-এর বরকত ইয়াকুবের দিকে স্থানান্তরিত হয়।*

একথা ইহুদীরা তাদের নিজেদের বই-পত্রে প্রচার করে থাকে। ইসহাক ﷺ-এর প্রতারিত হয়েছেন, ইয়াকুব ﷺ হয়েছেন হাসির পাত্র, আর হাসির হয়েছে সে-ও, যে এই কথা পড়ে।

এগুলো কি মহাবিশ্বের রব আল্লাহর সাথে বিদ্রুপ নয়? এমন ধোঁকা ও প্রতারণার ব্যাপারে আমাদের রব কীভাবে নীরব থাকতে পারেন? এজন্য আমরা বনী ইসরাইলের চেয়েও তাদের নবীদের বেশি আপন।

তারা বলে থাকে, ইয়াকুব ﷺ রবের সাথে কুস্তি লড়েছিলেন। ভেবে দেখুন, তাদের বর্তমান তাওরাতে একথার উল্লেখ রয়েছে। আরও দূর্ভোগের বিষয় হচ্ছে তারা বলে, ইয়াকুব ﷺ রবের উপর বিজয়ী হন। রবকে পরাজিত করেন। চিন্তা করে দেখুন, ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ বলছে ইয়াকুব ﷺ রবকে পরাজিত করেছেন। আরও লক্ষ্য করুন, তাদের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার মাত্রা। যখন রব হেরে গিয়ে বিপাকে পড়ে যান, তখন এই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে তিনি কী করেন? তিনি বলেন, *আমাকে মুক্ত করো, আমি তোমাকে বরকত দিয়ে দিব। এরপর রব বাধ্য হয়ে ইয়াকুব (ইসরাইল) ও তার বংশধরকে বরকত দিয়ে দেন।* বলুন, এটা কি কোনো বোধগম্য কথা?

অথচ আমরা বলি, আমরা এসব ইতিহাস পড়ব না! [না,] আমরা এই ভূখণ্ডের ইতিহাস পড়ব, যাতে ইহুদীদের নবীদের পবিত্রতা প্রমাণ করতে পারি। মুছে দিতে পারি সেইসব কালিমা, যেগুলো তাদের উপর ইহুদীরা লেপন করেছে। এসব কথা বিদ্যমান রয়েছে ইহুদীদের নিজেদের বর্ণনায়। তাদের তাওরাতে। পুরাতন ও নতুন ভার্সনে।

CamScanner

ইতিহাস খুব দীর্ঘ। এজন্য আমরা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে মানব সভ্যতার প্রথম বিকাশ থেকে শুরু করব। ধারণা করা হয়, দুনিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার হয়েছে ফিলিস্তিনের ভূমিতে, যা প্রায় দেড় মিলিয়ন বছরের পুরানো। সুতরাং এটা এমন এক ভূখণ্ড, যার ইতিহাস খুব দীর্ঘ। যার সূচনা প্রাচীন প্রস্তর যুগ থেকে।

যেহেতু তখন পর্যন্ত দুনিয়াতে কোনো খনিজ পদার্থ আবিষ্কার হয়নি, তাই সবধরণের হাতিয়ার তখন তৈরি করা হত পাথর দিয়ে। এই প্রস্তরের ব্যবহারের কারণে এই যুগকে প্রস্তর যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর প্রস্তর যুগের সমস্ত বিবরণ ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে পাওয়া যায়।

প্রস্তর যুগকে সাধারণত চারটি বিশেষ ধাপে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। সে ধাপগুলো হচ্ছে–

প্রথম ধাপ : শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের পর্ব। এই যুগে মানুষের কোনো স্থিরতা ছিল না। আদিম মানুষ সে যুগে খাদ্যের সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত। সে ছিল এক স্থিতিহীন যুগ। শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ করে মানুষ মাঝে মাঝে কোথাও বিরতি নিত। কিছুদিন পর অন্যত্র চলে যেত।

দ্বিতীয় ধাপ : কৃষি জনপদের পর্ব। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে প্রাচীন কৃষি জনপদের প্রমাণ পাওয়া যায়।

তৃতীয় ধাপ : পেশাগত কৃষি জনপদের পর্ব।

চর্তুথ ধাপ : কতিপয় গ্রন্থে এই ধাপকে ধাতুর যুগ বলে উল্লেখ করা হয়। কেননা, ইতোমধ্যে তামা আবিষ্কৃত হয় এবং অনেক যন্ত্র নির্মাণে তামার ব্যবহার শুরু হয়।

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে এ সবগুলো ধাপেরই অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এ বিষয়টি আমাদের পরস্পরকে প্রশ্ন করতে বাধ্য করে যে, কেন ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে যুগ যুগ ধরে এসবকিছুর এমন সমাহার? উত্তর হচ্ছে, এটা সেই বরকতের কারণে, যার দিকে আমাদের রব তাঁর কিতাবে ইঙ্গিত করেছেন–

> আমি তাকে (ইবরাহীম) ও লূতকে মুক্তি দিয়ে প্রেরণ করলাম সেই ভূখণ্ডের দিকে, যেখানে আমি গচ্ছিত রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য বরকতের সমাহার। [সুরা আম্বিয়া : ৭১]

এ ভূখণ্ডের রয়েছে যথেষ্ট উৎপাদন ক্ষমতা। এখানে সারা বছর বৃষ্টি হয়। বছর জুড়ে তাপমাত্রা থাকে স্বাভাবিক। শীত ও গ্রীষ্ম উভয় মৌসুমেই তাপমাত্রা ১৯ থেকে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে।

ফিলিস্তিন এমন একটি ভূখণ্ড, যা সারা দুনিয়ার মধ্যভাগে অবস্থিত। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ তিন মহাদেশের সম্মিলনস্থল। এ ভূখণ্ডের কল্যাণ ও বরকত অফুরন্ত। তাই মিলিয়ন মিলিয়ন বছর যাবৎ এ ভূখণ্ডে মানুষের বসবাস।

এখন আমরা প্রস্তর যুগের উপর কিছু পর্যালোচনা তুলে ধরব। ফিলিস্তিনে আবিষ্কৃত হয় দুনিয়ার সর্বপ্রথম নগর। ফিলিস্তিন সেই ভূখণ্ড, যেখানে মানুষ নগর নির্মাণের জন্য প্রথম সমবেত হয়েছিল। ঘটনাটি ঘটে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম সহস্রাব্দে। তা হচ্ছে আমাদের সবার পরিচিত নগর আরিহা। আরিহা হচ্ছে মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম নগর।

প্রস্তর যুগে ফিলিস্তিনে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের মূল অজ্ঞাত। এ যুগের সময়কাল হচ্ছে প্রাচীণ কাল থেকে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ পর্যন্ত। এই ধাপের শেষে দুনিয়াতে সাধিত হয় বিরাট উন্নয়ন। তা হল লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার। এর মাধ্যমে মানুষ প্রবেশ করে ইতিহাসোত্তর যুগে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হল লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের আগের যুগ। সে যুগের সবকিছু প্রত্নতত্ত্ব নির্ভর। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০০ সালে অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচ সহস্রাধিক বছর আগে মানুষ লিখতে শিখেছিল। তখন থেকে আমরা দুনিয়ার মানুষ সম্পর্কে অনেক তথ্য পেতে শুরু করেছি।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ সালের পর আমরা ব্রোঞ্জ যুগ বলে পরিচিত এক যুগে প্রবেশ করি। এই যুগে মানুষ টিন আবিষ্কার করে এবং তার সাথে তামা মেশালে ব্রোঞ্জ আবিষ্কৃত হয়। ব্রোঞ্জ উদ্ভাবনের পর মানুষ প্রচুর যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করতে থাকে।

CamScanner

ব্রোঞ্জ যুগের প্রতিটি ধাপ ফিলিস্তিনে দৃশ্যমান। ব্রোঞ্জ যুগকে মূলত ৩টি ধাপে বিভক্ত করা হয়। প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগ, মধ্য ব্রোঞ্জ যুগ ও আধুনিক ব্রোঞ্জ যুগ।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ সাল থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগ। অর্থাৎ প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগের সময়কাল প্রায় ১২০০ বছর। এই ধাপে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এ যুগে যারা ফিলিস্তিনের বাসিন্দা ছিল, তাদের মূল পরিচয় ও বৈশিষ্ট জানা। এই পরিচয় প্রমাণ করবে ইহুদীদের অসংখ্য দাবির অসাড়তা।

ইহুদীরা তাদের মিডিয়া ব্যবহার করে যুগ যুগ ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বত্র প্রচার করে যাচ্ছে যে, তারা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের প্রথম বাসিন্দা। এবং তারা এ ভূখণ্ড প্রথম আবাদ করেছে। আর বসবাসের দিক থেকে অগ্রবর্তী বলে তারা মানুষের কাছে দাবি করে যে, এই ভূখণ্ডের তারা বেশি হকদার।

আমরা বলব, আসুন, প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাদি ঘেঁটে দেখা যাক। ফারাও ও ব্যাবিলনদের নথিপত্র অনুসন্ধান করা যাক। ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন উপাসনালয় ও গুহা থেকে আবিষ্কৃত দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে দেখা যাক। দেখে নেওয়া যাক প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগে কারা ছিল ফিলিস্তিনের অধিবাসী।

ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের প্রথম বাসিন্দা হচ্ছে কেনানী জনগোষ্ঠী। কেনানী সম্প্রদায়ের প্রতিটি শাখা আরব বংশোদ্ভূত। আরব উপদ্বীপ থেকে তারা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে হিজরত করেছিল। অধিকাংশ মানুষই এ বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত নয় যে, আরবরা হচ্ছে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের প্রথম ও প্রাচীন অধিবাসী। যারা আরব উপদ্বীপ হতে হিজরত করে এখানে এসে বসবাস শুরু করেছিল।

এসব আরব ছিল মূর্তিপূজক। তারা কোনো ধর্মেরই অনুসারী ছিল না। আমরা তাদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হই না। তবে আমরা ইহুদীদের ফিলিস্তিনের প্রথম বাসিন্দা হওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করি। কেনানীদের নিয়ে আমরা গর্ববোধও করি না। যেহেতু তারা মহাপরাক্রমশালী

আল্লাহর এবাদত করত না। তবে আমরা প্রমাণ করব যে, তারাই ছিল ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের প্রথম আদি বাসিন্দা। যাতে ইহুদীরা জেনে নেয়, তারা যেসব বর্ণনা প্রচার করে তা নিতান্তই মিথ্যা।

এমনকি খোদ ইহুদীরাও তাদের বিকৃত ও বানোয়াট তাওরাতে স্বীকার করে যে, কেনানী সম্প্রদায়ই ইহুদীদের আগে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে বসবাস করেছিল। এখানে তাদের কথার মধ্যে রয়েছে সংঘর্ব।

ইহুদীরা তাওরাতে দাবি করে যে, আল্লাহ ﷻ কেনানীদের এই ভূখণ্ড ইহুদীদেরকে দান করেছেন। সেখানে তারা এই ভূখণ্ডকে কেনানীদের ভূখণ্ড বলেই উল্লেখ করেছে। অতএব, তারাও এ সত্য জানে যে, কেনানীরা ইহুদীদেরও আগে এই ভূখণ্ডে বসবাস করেছিল।

কেনানীরা ফিলিস্তিনে গড়ে তুলেছিল দুই শতাধিক শহর। যেমন, নাবলুস, বাইসান, আসকালান, আক্কা, হাইফা, বির আল-সাবা ও বাইতুল লাহম (বেথেলহেম) প্রভৃতি। খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ সালে কেনানীরা ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল। অর্থাৎ ইহুদীদের ফিলিস্তিনে আসার ১৪০০ বছর আগে।

ফিলিস্তিনের ভূমিতে বসবাসকারী আরও একটি সম্প্রদায় রয়েছে। তারা হল ফিনিশিয়ান সম্প্রদায়। অবশ্য ফিনিশিয়ানরা আরব কেনানীদেরই একটি শাখা। প্রাচীনকালে তারা সিরিয়ার নিকটবর্তী উত্তর ফিলিস্তিনীয় অঞ্চলে বসবাস করেছে। ইতিহাসখ্যাত সেই প্রসিদ্ধ ফিনিশিয়ান সভ্যতা তাদেরই অবদান।

ফিলিস্তিনে বসবাসকারী আরও একটি জনগোষ্ঠী হল আমোরীয় সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ও আরব বংশোদ্ভূত। তাদের মধ্য থেকে আবির্ভাব হয় 'হেকসোস' সম্প্রদায়ের। যারা পরবর্তীতে মিসর, ফিলিস্তিন ও শামের বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল।

আমোরীয় সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ কীর্তি হচ্ছে আল-কুদস শহরের গোড়াপত্তন। তারা এ শহরকে প্রথমে 'উরসালিম' নাম দেয়। পরবর্তীতে তা 'উরশালীম' এ রূপান্তরিত হয়। বর্তমান ইহুদীরা শহরটির এই নামই ব্যবহার করে থাকে।

CamScanner

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে বসবাসকারী আরও একটি সম্প্রদায় রয়েছে। এ সম্প্রদায় ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে আগমনকারী সর্বশেষ জনগোষ্ঠী। যারা এই সময়কালে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেনি; বরং কয়েকশ বছর পর প্রবেশ করেছে। তারা হচ্ছে ব্লেস্ট জনগোষ্ঠী। ভূমধ্য সাগরের ক্রিট দ্বীপ থেকে আগত একটি জনগোষ্ঠী। ক্রিট দ্বীপ থেকে অগ্রসর হয়ে প্রথমে তারা মিসরীদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তবে ফারাও সম্রাট তৃতীয় রামসিস তাদেরকে প্রতিরোধ করেন। অবশেষে এ মর্মে সন্ধি হয় যে, ব্লেস্ট সম্প্রদায় ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে বসবাস করবে। এ ব্লেস্ট গোত্রই বর্তমান ফিলিস্তিনকে প্যালেস্টাইন (Palestine) নাম দেয়। তবে এরাও ইহুদী ছিল না।

এ হল প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগ। এ যুগের ঐতিহাসিক তথ্যাবলি সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখেনি যে, আরবরাই হচ্ছে ফিলিস্তিনের প্রথম বাসিন্দা। আরব হিসাবে আমরা একথা বলছি না। ফিলিস্তিন নিজেদের দাবি করেও একথা বলছি না; বরং আমরা ইহুদীদের দাবি– তারাই সবার আগে ফিলিস্তিনে বসবাস করেছিল– প্রত্যাখ্যান করার জন্য বলছি। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে মুসলমানদের অগ্রাধিকার এজন্য নয় যে, আরবরা এখানকার প্রথম বাসিন্দা। তারা তো ছিল মূর্তিপূজক। বরং এজন্য যে, ইসলাম এ ভূখণ্ড শাসন করে আসছে ১৬ হিজরী থেকে। তখন থেকেই ফিলিস্তিন ইসলামী ভূখণ্ড।

এখন দেখা যাক, ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে মধ্যব্রোঞ্জ যুগে কী ঘটে?

এই ভূখণ্ডে ইবরাহীম ﷺ-এর ইতিহাস কী?

কীভাবে তিনি এই ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন?

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ইবরাহীম ﷺ-এর সন্তানদের ইতিহাস কী?

ইহুদীরা কখন এই ভূখণ্ডে প্রবেশ করে?

মধ্য ব্রোঞ্জ যুগে ফিলিস্তিন

প্রস্তর যুগ নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য নিয়ে বের হয়ে এসেছি। যেমন, দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত নগর হচ্ছে ফিলিস্তিনের আরিহা। খ্রিস্টপূর্ব ৮ হাজার বছর আগে যার গোড়াপত্তন হয়। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে।

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম মানুষের প্রবেশ ঘটে দেড় মিলিয়ন বছর আগে। আমরা জেনেছি, প্রস্তর যুগে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে যেসব জনগোষ্ঠী বসবাস করত, তাদের মূল অজ্ঞাত।

এরপর আমরা প্রবেশ করেছি ব্রোঞ্জ যুগে। ব্রোঞ্জ যুগকে আমরা তিনটি বিশেষ ধাপে বিভক্ত করেছি। প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগ, মধ্য ব্রোঞ্জ যুগ, আধুনিক ব্রোঞ্জ যুগ। প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। এ আলোচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ওইসব জনগোষ্ঠীর আলোচনা, যারা লিখন-রীতির যুগে বা ইতিহাসের যুগে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে বসবাস করেছিল। আমরা ফিলিস্তিনের সেই জনগোষ্ঠীর কথাও আলোচনা করেছি, যারা এই ভূখণ্ডের নামকরণ করে। তারা হচ্ছে ফ্লেস্ট জনগোষ্ঠী।

এরপর আসে মধ্য ব্রোঞ্জ যুগ, যা খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সাল থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ ফিলিস্তিনের ইতিহাসের ৪৫০ বছরের একটি ধাপ। এই যুগ খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি, ফিলিস্তিনের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুগ। কেননা, এটাই প্রথম যুগ, যখন ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড আল্লাহর একত্ববাদ প্রত্যক্ষ করে। আগে এ ভূখণ্ড ছিল মূর্তিপূজার লীলাভূমি। কেনানী ও ফিনিশিয়ানরা

CamScanner

ছিল মূর্তিপূজক সম্প্রদায়। কিন্তু তাওহীদের সূচনা, আল্লাহ ﷻ-এর পরিচয়, এবাদতের পদ্ধতি কী, সঠিক পন্থায় শরয়ী জীবনধারা কেমন হয়ে থাকে– এসবকিছু ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড প্রত্যক্ষ করে তখন, ইবরাহীম ﷺ যখন তার মূল জন্মভূমি ইরাক থেকে হিজরত করে এ ভূখণ্ডে আগমন করেন।

ইবরাহীম ﷺ হচ্ছেন নবীদের পিতা। ইরাকের উর শহরে তিনি প্রেরিত হন। এখানে দীর্ঘ সময় বসবাস করেন। আল্লাহ ﷻ-এর কাছে দোআ করেন। এই শহরে তাঁর ও বাদশাহ নমরূদের মধ্যে সংঘটিত হয় বাদানুবাদ ও অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের ঘটনা। এরপর আল্লাহ ﷻ ইবরাহীম ﷺ-কে মুক্তি দেন। যা খুব প্রসিদ্ধ ঘটনা। এরপর আল্লাহ ﷻ তাকে হিজরতের নির্দেশ দেন। যেমন আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেন–

> আর আমি তাকে (ইবরাহীমকে) ও লুতকে মুক্তি দিলাম। প্রেরণ করলাম এমন ভূখণ্ডে, যাতে আমি বরকত দিয়েছি বিশ্ববাসীর জন্য। [সুরা আম্বিয়া : ৭১]

যেই ভূখণ্ডে আল্লাহ বরকত দিয়েছেন, তা হচ্ছে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড। ইবরাহীম ﷺ ইরাকের উর থেকে ফিলিস্তিনের শাকিন নামের এক গ্রামে হিজরত করেন। সেটা ছিল নাবলুস শহরের কাছে, যা শাকিনেরও কয়েকশ বছর আগে কেনানীদের হাতে স্থাপিত হয়েছিল।

ইবরাহীম ﷺ শাকিন বা নাবলুস-এর বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু তিনি এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরে বেড়াতেন। এই সুবাদে তিনি আল-কুদস ও বেথেলহেম প্রভৃতি শহরে গমন করেন। ওই সময় ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড শাসন করত হেকসোস সম্প্রদায়। হেকসোসরা ছিল আমোরীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। যারা প্রায় ২০০ বছর ফিলিস্তিন শাসন করেছিল। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ২০৭ বছর। খ্রিস্টপূর্ব ১৭৭৪ থেকে ১৫৬৭ সাল পর্যন্ত। এক পর্যায়ে ফিলিস্তিন থেকে তারা শাম দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর তারা মিসর দখল করে। এ সময় ইবরাহীম ﷺ ফিলিস্তিনে বসবাস করেন।

হেকসোস সম্প্রদায়ের যে বৈশিষ্ট্য মিসর ও ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে আল্লাহ ﷻ-র একত্ববাদের দাওয়াতের পথ সুগম করেছিল, তা হল

তাদের সাম্রাজ্যের ধর্মীয় স্বাধীনতা। হেকসোসদের সাম্রাজ্যে নির্দিষ্ট কোনো ইলাহের উপাসনার জন্য জবরদস্তি ছিল না। তারা ছিল মূর্তিপূজক জনগোষ্ঠী। তবে নির্দিষ্ট কোনো ইলাহের উপাসনাতে তাদের পক্ষ থেকে কোনো বাধা ছিল না। তারা ইবরাহীম ﷺ-কে আল্লাহ ﷻ-এর দিকে দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। কোনো প্রকারের বাধা-বিঘ্ন, জুলুম-অত্যাচার ছিল না। যেগুলো ইরাকের ভূখণ্ডে ইবরাহীম ﷺ-কে ভোগ করতে হয়েছিল। ফলে ইবরাহীম ﷺ ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে বাধা-বিপত্তিহীন স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন-যাপন করেন।

ইবরাহীম ﷺ-এর সন্তান লাভের ক্ষেত্রে বিলম্বের ইতিহাস আমাদের সবারই জানা। এরপর তার উপর মিসর হিজরত করার নির্দেশ হয়। মিসর হিজরতকালে সেখানকার শাসকশ্রেণির সাথে সেই বিড়ম্বনার ঘটনা ঘটে। হেকসোস সম্প্রদায় তখনও মিসরের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেনি। ইবরাহীম ﷺ ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে এসেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ সালে। অর্থাৎ হেকসোসদের মিসর প্রবেশের ১০০ বছর আগে। তবে ইবরাহীম ﷺ দীর্ঘ আয়ু পেয়েছিলেন। বিশুদ্ধ বর্ণনানুসারে তিনি বয়স পেয়েছিলেন ১৭৫ বছর। শেষ জীবনে তিনি মিসর হিজরত করেন এবং হাজেরাকে নিয়ে ফিরে আসেন। হাজেরা ছিলেন একজন মিসরী রাজকন্যা।

ইবরাহীম ﷺ হাজেরাকে বিয়ে করেন। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে তাদের থেকে জন্ম হয় ইসমাঈল ﷺ-এর। এরপর ইবরাহীম ﷺ পুত্র ইসমাঈল ও তদীয় মাতা হাজেরাকে নিয়ে আরব উপদ্বীপের এক জনমানবহীন ভূমিতে হিজরত করেন। ইবরাহীম ﷺ-কে তাঁর রব হিজরতের স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তা হল মক্কা মুকাররামা। এ সময় মক্কার ভূমিতে সংঘটিত হয় সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা।

এই কাহিনী থেকে যে কথার সাক্ষ্য পাই, তা হল ইসমাঈল ﷺ ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডের সাথে আমাদের নবী ﷺ-এর রয়েছে শিকড়ের সম্পর্ক। ফিলিস্তিনের বরকতময় ভূমির জন্য এসম্পর্ক খুবই সম্মানের।

CamScanner

এমনইভাবে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে সাইয়্যিদা সারার গর্ভে ইবরাহীম ﷺ-এর আরেক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হচ্ছেন ইসহাক ﷺ। এটা ছিল ইসমাঈল ﷺ-এর জন্মের ১৩ বছর পরের ঘটনা। ইসহাক ﷺ-এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন ইয়াকুব ﷺ। ইবরাহীম ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই ইয়াকুব ﷺ-এর জন্ম হয়। এর প্রমাণ হল কুরআনে বর্ণিত সাইয়্যিদা সারাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ প্রদান। *আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের। ইসহাকের পরই ইয়াকুব।* [সুরা হুদ : ৭১] ইসহাক ও ইয়াকুব ﷺ-এর সুসংবাদ ছিল সারা ও ইবরাহীম ﷺ-এর জীবদ্দশায়।

ইয়াকুব ﷺ প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০ সালে ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কাহিনী খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং ফিলিস্তিনের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। ইয়াকুব ﷺ-এর কাহিনীতে প্রবেশ করার আগে আমরা আরও কিছু সময় নিব ইবরাহীম ﷺ-এর সাথে।

ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলিম– সবাই ইবরাহীম ﷺ-কে নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। সবাই তাকে নিজেদের দাবি করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই ইবরাহীম ﷺ-এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া নিয়ে গর্ভবোধ করে। তবে আমরা মুসলমানরা ইবরাহীম ﷺ-এর বেশি আপন। যদিও ইহুদী-খ্রিস্টানরাও এমনই দাবি করে। কুরআন মাজীদের সুরা আলে ইমরান-এ আমাদের রব এই মামলার মীমাংসা করে দিয়েছেন। তিনি বলেন–

> হে আহলে কিতাবগণ! কেন তোমরা ইবরাহীমের বিষয়ে বাদানুবাদ কর? অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তাঁর পরেই নাযিল হয়েছে। তোমরা কি বুঝ না? [সুরা আলে ইমরান : ৬৫]

অর্থাৎ কীভাবে তোমরা দাবি কর যে, তিনি ইহুদী ছিলেন, অথচ ইহুদী ধর্ম এসেছে মুসা ﷺ-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পর। ইবরাহীম ﷺ-এর কয়েকশ বছর পর ছিল মুসা ﷺ-এর আগমন!

আর কীভাবে তোমরা বল, তিনি খ্রিস্টান ছিলেন? অথচ ইবরাহীম ﷺ-এর মৃত্যুর এক হাজার সাতশ বছর পর ইসা ﷺ-এর উপর ইঞ্জীল অবতীর্ণ হয়েছে! তোমাদের কি বিবেক-বুদ্ধি নেই?

> শোনো! ইতোপূর্বে তোমরা যে বিষয়ে কিছু জানতে, তাই নিয়ে বিবাদ করতে। এখন আবার যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না, সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছ? [সুরা আলে ইমরান : ৬৬]

এরপর চূড়ান্ত মীমাংসা করে বলেন–

> ইব্রাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং খ্রিস্টানও ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন হানীফ (অর্থাৎ সব মিথ্যা ধর্ম থেকে বিমুখ) এবং আত্মসমর্পণকারী, এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না। [সুরা আলে ইমরান : ৬৭]

এরপর বলেন–

> মানুষদের মধ্যে যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল, তারা, আর এই নবী এবং যারা এই নবীর প্রতি ঈমান এনেছে, তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম– আর আল্লাহ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু। [সুরা আলে ইমরান : ৬৮]

অর্থাৎ ইবরাহীম ﷺ-এর অনুসরণ কথা, প্রজন্ম ও বংশ দিয়ে নয়; বরং তার অনুসারী হওয়া যাবে তাঁর আনা দীনে হানীফের অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে। আল্লাহ ﷻ, পরকাল, নবী-রসুল ও আসমানী কিতাবসমূহের উপর বিশুদ্ধ আকিদা পোষণের মধ্য দিয়ে। এসব বিষয়ের উপর ঈমান আনা ও বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করা আবশ্যক তার জন্য, যে নিজেকে ইবরাহীম ﷺ-এর অনুসারী দাবি করে। অথবা দাবি করে তাঁর নিকটজন হওয়ার।

ইসরাইল তথা ইয়াকুব ﷺ ইহুদীদের পিতা হওয়া সত্ত্বেও কেন ইহুদীরা ইবরাহীম ﷺ-কে অবলম্বন করে? তাদের পিতা ইয়াকুব ﷺ তো ইবরাহীম ﷺ-এর পরে আগমন করেছিলেন!

বিকৃত তাওরাতের ভাষ্যমতে, ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড এবং বৃহত্তর ইসরাইল যাকে দেওয়া হয়েছে– তিনি ইবরাহীম ﷺ ও তার বংশধর। বিকৃত তাওরাতে ইহুদীরা বলে– *হে ইবরাহীম! আপনার বংশধরকে দেওয়া হল এ ভূখণ্ড। মিসরের নদী থেকে ফুরাতের বড় নদী পর্যন্ত।*

অর্থাৎ তাদের ভাষ্যমতে আল্লাহ ﷻ নীল নদ ও ফুরাত নদীর মধ্যকার ভূখণ্ড ইবরাহীম ﷺ ও তার বংশধরদের দিয়ে দিয়েছেন। আমরা এ বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করে বলি–

প্রথমত : বর্তমান তাওরাত একটি বিকৃত গ্রন্থ।

দ্বিতীয়ত : যদি এই শ্লোক সঠিকও হয় তা হলে ইবরাহীম ﷺ-এর বংশধর ইসহাক, ইয়াকুব ও ইসমাঈল ﷺ। এবং ইসমাঈলের পরবর্তী বংশধর মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর উম্মত।

তৃতীয়ত : এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান যুগে যেসব ইহুদী রয়েছে, তাদের অধিকাংশই না ইয়াকুব ﷺ-এর বংশের, আর না ইবরাহীম ﷺ-এর বংশের। তারা হচ্ছে খাযার ইহুদী (Zewish Khazars)।[২] খ্রিস্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে তারা ইহুদীবাদ গ্রহণ করে। অর্থাৎ ইয়াকুব ﷺ-এর বহু শতাব্দী পর। অতএব, তাদের মূল ইবরাহীম ও

---

২. খাযার সম্প্রদায় একটি নন-সেমিটিক জনগোষ্ঠী। সেমিটিক বনী ইসরাইলের সাথে তাদের বংশগত কোনো সম্পর্ক নেই। এ বৃহত্তর খাযার সম্প্রদায় ইউরোপ ও সেন্ট্রাল এশিয়া জুড়ে খাযারিয়া সাম্রাজ্য নামে এক বিরাট শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। খ্রিস্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে তাদের পুরো সম্প্রদায় বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে। খাযারদের কিছু সংখ্যক লোক খ্রিস্টধর্মও গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এ খাযার ইহুদী ও খ্রিস্টানদের হাত ধরেই আত্মপ্রকাশ করে জায়নিস্ট মুভমেন্ট। এই সাদা চামড়ার ইউরোপিয়ান খাযার ইহুদীদের সাথে বাদামি চামড়ার সেমিটিক ইহুদীদের কোনো সাদৃশ্যই নেই।
এক পর্যায়ে খাযাররা তাদের খাযারিয়া সাম্রাজ্য থেকে বেড়িয়ে পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। পাড়ি জমায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। বিস্ময়করভাবে তারা পাশ্চাত্য থেকে ধর্মকে ছাটাই করে গড়ে তোলে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা। আধুনিক বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সবকিছুই তারা কুক্ষিগত করে রেখেছে। যায়নবাদী খাযার ইহুদী ও খ্রিস্টানদের দীর্ঘ ষড়যন্ত্র ও নীল নকশারই ফসল আজকের ইসরাইল রাষ্ট্র। ইউরোপীয়ান খাযার ইহুদিদের হাতেই ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা। চলমান নাশকতা, ধ্বংযজ্ঞ, ফিতনা-ফাসাদ ও সকল অমানবিকতার মূল চাবিকাঠি এরাই নাড়ে। আর সংখ্যালঘু সেমিটিক ইহুদিরা বর্তমান ইসরাইলের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। তাদের সংখ্যা শতকারা ১০% এরও কম। –অনুবাদক

ইয়াকুব ﷺ-এর সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাই যদি তাওরাতের এই শ্লোক সঠিকও হয়, তবুও এ ভূখণ্ড ইহুদীদের নেওয়া বৈধ হবে না। কেননা, তা বিশেষ বংশধরকে দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে আমরা বলব, আল্লাহ ﷻ ইমামত দিয়েছেন ইবরাহীম ﷺ-এর বংশের নেককারদেরকে; জালেমদেরকে নয়। আল্লাহ ﷻ ইবরাহীমের বক্তব্য তুলে ধরে বলেন—

> যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, এবং তিনি সেগুলো পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছবে না। [সুরা বাকারা :১২৪]

অতএব, যারা জুলুম করে, সত্যকে বিকৃত করে মিথ্যায় রূপান্তর করে— এ ভূখণ্ডে তাদের কোনো হক নেই। কেননা, এই ইমামত আল্লাহ ﷻ শুধু নেককার বান্দাদের দিয়েছেন।

আমরা ইবরাহীম ﷺ-এর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছি। কীভাবে ইসমাঈল ﷺ-এর জন্ম হয়। এরপর ইসহাক ﷺ-এর। তারপর ইসহাক ﷺ-এর ঔরসে ইয়াকুব ﷺ-এর। আমরা প্রমাণ করেছি যে, ইবরাহীম ﷺ-এর ঘনিষ্ঠ তারাই, যারা তাঁর অনুসরণ করে। আর তারা হলেন, মুসলমান, নবী-রসুল ও নেককার বান্দারা। শেষ নবী, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ হলেন পুরো মানবসমাজের মধ্যে ইবরাহীম ﷺ-এর অধিক ঘনিষ্ঠতম।

এখন আমরা জানব ইবরাহীম ﷺ-এর জীবনের অতিগুরুত্বপূর্ণ এক অংশ। তা হল আল্লাহ ﷻ তাঁকে একাধিকবার হেজাযের ভূমিতে হিজরত করার নির্দেশ দেন। প্রথম হিজরত ছিল সাইয়্যিদা হাজেরা ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল ﷺ-কে সাথে নিয়ে। তিনি তাদেরকে মক্কার ভূখণ্ডে রেখে আসেন। যে ঘটনা আমাদের সকলেরই জানা।

ইসমাঈল ﷺ সেখানেই লালিত-পালিত হন এবং বেড়ে ওঠেন। ইবরাহীম ﷺ তাদেরকে সেখানে রেখে চলে আসেন ফিলিস্তিনের

CamScanner

ভূখণ্ডে। এর কিছুকাল পর আমাদের রব আবার তাঁকে মক্কায় যাওয়ার নির্দেশ দেন। বাইতুল্লাহর বুনিয়াদ স্থাপনের জন্য। যা খুবই প্রসিদ্ধ ঘটনা। আমাদের রব ﷻ বলেন–

> স্মরণ করো, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দোয়া করেছিল, পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। [সুরা বাকারা : ১২৭]

কাজেই ইবরাহীম ﷺ আবার মক্কায় গমন করেন। বাইতুল্লাহর ভিত্তি উত্তোলন করেন এবং কাবা স্থাপিত হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন। প্রশ্নটি আমাদের অনেকের জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, সেটা কাবার সূত্রের সাথে গ্রথিত। তা হল ফিলিস্তিনের আল-কুদস শহরে মসজিদে আকসা নির্মাণ নিয়ে। মসজিদে আকসা কে নির্মাণ করেছিলেন? কখন নির্মিত হয়? আকসা নামে কেন ডাকা হয়?

আরবরা এর নাম দিয়েছে আল-মাসজিদুল আকসা। কেননা, এটা আরব উপদ্বীপ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল, যেখানে আল্লাহ ﷻ-র উপাসনা করা হত। মক্কা মুকাররামা থেকে অনেক দূরে হওয়াতেই আরবরা একে মসজিদে আকসা (দূরবর্তী মসজিদ) নাম প্রদান করে। আর এই নামই সুরক্ষিত হয়ে যায়। এমন কি আমাদের রব ﷻ তাঁর কিতাবে এই নামই উল্লেখ করেছেন–

> পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যান্ত, যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি। [সুরা বনী-ইসরাঈল : ১]

দ্বিতীয় প্রশ্ন মসজিদে আকসা কে নির্মাণ করেছিলেন?

এ বিষয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। বিষয়টি সহজ করার জন্য আমি বলব, আকসা মসজিদের মূল নির্মাতা আদম ﷺ। খানায়ে কাবারও নির্মাতা আদম ﷺ। আগে তিনি কাবা নির্মাণ করেন, তারপর নির্মাণ করেন মসজিদে আকসা। এ বিষয়ে আবু যার ﷺ রসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

আবু যার ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! দুনিয়াতে নির্মিত প্রথম মসজিদ কোনটি? রসুল ﷺ বলেন, মসজিদে হারাম। আবু যার ﷺ বলেন, আমি জানতে চাইলাম এরপর কোনটি? তিনি বলেন, মসজিদে আকসা। আমি বললাম, উভয় মসজিদ নির্মাণের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান কত বছরের? তিনি বলেন, ৪০ বছর। [বুখারী : ৩৪২৫]

দুনিয়ার সব মুসলমানের কাছে দুটি পবিত্র মসজিদ ও পবিত্র স্থানের মধ্যে এটা সুস্পষ্ট বন্ধন। খুব শক্তিশালী বন্ধন। আদম ﷺ প্রথমে কাবা ঘর নির্মাণ করেন। এর ৪০ বছর পর নির্মাণ করেন মসজিদে আকসা। এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত। এমতানুযায়ী ইবরাহীম ﷺ যখন বাইতুল্লাহর ভিত্তি উত্তোলন করেন, তখন বাইতুল্লাহর বুনিয়াদ মজুদ ছিল। তবে কালের আবর্তন ও যুগের ঘূর্ণিপাকে কাবা ঘর ক্ষতিগ্রস্থ ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। তার নিদর্শন মুছে গিয়েছিল। শুধু পুরানো ভিত্তি বাকি ছিল। যেমন, আমাদের রব উল্লেখ করেছেন—

> স্মরণ করো, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। .... [সুরা বাকারা : ১২৭]

তা হলে ইবরাহীম ﷺ বাইতুল্লাহ নবায়ন এবং তা পূনঃনির্মাণ করে থাকবেন।

যদি আমরা ধরে নিই যে, ইবরাহীম ﷺ-ই কাবা ঘরের প্রথম নির্মাতা; আদম ﷺ নন। তখন মসজিদে আকসার নির্মাতা হবেন ইয়াকুব ﷺ। বাইতুল্লাহ নির্মাণের ৪০ বছর পর যা নির্মিত হয়েছিল। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, সুলাইমান ﷺ আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় একটা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

> আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন— যখন সুলাইমান ইবনু দাউদ ﷺ বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শেষ করেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে তিনটি আর্জি পেশ করেন...। [ইবনু মাজা : ১১৫৬]

CamScanner

এ হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহর নবী সুলাইমান ﷺ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটা মসজিদ নির্মাণ করেন। সেটা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের মসজিদে আকসা। এখান থেকে ধারণা করা হয়, সুলাইমান ﷺ সেই ভিত্তি নবায়ন করেন, যা আদম ﷺ নির্মাণ করেছিলেন বা আদম ﷺ-এর পরবর্তীতে ইয়াকুব ﷺ নির্মাণ করেছিলেন।

কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায় দাউদ ﷺ বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ শুরু করেছিলেন এবং সুলাইমান ﷺ তা সমাপ্ত করেন।

এসব কাহিনী যা প্রমাণ করে, তা হল মসজিদে হারামের নির্মাতা আল্লাহর নবীদের মধ্য থেকে এক নবী। তেমনইভাবে মসজিদে আকসার নির্মাতাও আল্লাহর নবীদের মধ্য থেকে কোনো এক নবী। উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল চল্লিশ বছর। এভাবে মসজিদে হারাম আর ফিলিস্তিনের মসজিদে আকসার মধ্যে রয়েছে এক দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধন।

ইয়াকুব ﷺ-ই হলেন ইসরাইল। তাওরাত বর্ণিত ইসরাইলই কুরআন-হাদীসে বর্ণিত ইয়াকুব ﷺ। বনী ইসরাইল হল ইয়াকুব ﷺ-এর সন্তান-সন্ততি ও বংশধর।

আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইবরাহীম ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই ইয়াকুব ﷺ জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তিনি এক দূরবর্তী এলাকায় হিজরত করেন। বলা হয়, তা হল হাররান। যা বর্তমান তুরস্কের দক্ষিণে অবস্থিত। সেখানেই তিনি জীবন-যাপন করতে থাকেন। হাররানে তার ঔরসে এগারো জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ইউসুফ ﷺ-এর ঘটনায় যাদের আলোচনা এসেছে। এরপর তিনি নতুন করে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে হিজরত করেন। ইউসুফ ﷺ-এর মিসর যাওয়ার পর ইয়াকুব ﷺ-এর দ্বাদশ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তিনি বিনইয়ামিন। যা আমাদের সকলেরই জানা।

ইউসুফ ﷺ-কে তার ভাইয়েরা কূপে ফেলে দেয়। এরপর তাকে মিসরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া হয়। মিসরে তার দীর্ঘ সময় কেঁটে যায়। মিসরের ভূখণ্ডে কষ্ট, দূর্ভোগ ও কারা-জীবনের বিশাল পথ পাড়ি দিয়ে এক পর্যায়ে তিনি মন্ত্রিত্বের পদ লাভ করেন।

এরপর ইয়াকুব ﷺ ও তাঁর সন্তানদেরকে তিনি মিসরে ডেকে পাঠান। ইয়াকুব ﷺ, তাঁর এগারো জন সন্তান, সন্তানদের স্ত্রী ও নাতি-নাতনী সবাইকে নিয়ে মিসরে চলে আসেন।

কথিত আছে, ইয়াকুব ﷺ-এর সাথে তাঁর পরিবারের যারা মিসর ভূখণ্ডে গমন করেন, তাদের সংখ্যা ছিল নারী-পুরুষ মিলিয়ে ৭২ জন। ইয়াকুব ﷺ-এর এগারো সন্তান এর পর থেকে মিসরেই বসবাস করতে থাকেন। এরাই হলেন সেই বংশধর যারা ইহুদী কাহিনীর মূল হিসাবে বিবেচিত।

আমি বলব, ইয়াকুব ﷺ যখন মিসরে ইউসুফ ﷺ-এর কাছে গমন করেন, তখন ছিল হেকসোসদের আমল। সেটা ফারাওদের আমল ছিল না। তখন মিসরের ভূখণ্ড ছিল হেকসোসদের দখলে। আর আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, হেকসোসদের সাম্রাজ্যে অবাধ ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল। তারা ইউসুফ ﷺ, ইয়াকুব ﷺ ও তাঁর সন্তানদেরকে তাওহীদের পথে দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়া দীনী জীবন-যাপনের সুযোগ করে দিয়েছিল। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলো প্রমাণ করে যে, কুরআন মানব-ইতিহাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা কুরআনের এক বিস্ময়। কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, ইউসুফ ﷺ-এর সময়কার মিসরের শাসক ছিলেন আযীয। কুরআন তাকে ফেরাউন বলেনি। কেননা, তখন ফারাও সম্রাটরা মিসরের শাসনক্ষমতায় ছিল না। মিসর তখন ছিল হেকসোসদের শাসনাধীন।

কুরআনে বলা হয়েছে–

> তারা বলল, হে আযীয! তার একজন অতিশয় বৃদ্ধ পিতা আছে। তার স্থানে আমাদের কাউকে রাখুন। আমরা লক্ষ্য করছি যে, আপনি ন্যায়পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত। [সুরা ইউসুফ : ৭৮]

কুরআনে এরূপ বর্ণনা একাধিক জায়গায় এসেছে। আযীয ছিলেন তৎকালীন হেকসোস সম্রাট।

ইউসুফ ﷺ ও তাঁর ভাইয়েরা দীর্ঘকাল মিসরে বসবাস করেন। বর্ণিত আছে, ইউসুফ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ তথা বনী ইসরাইলের এগারো গোত্র প্রায় ১৫০ বছর মিসরে বসবাস করেন। এ দীর্ঘ সময়ে সেখানে কোনো সমস্যা ছিল না। তারা ছিলেন আল্লাহ ﷻ-এর একত্ববাদের ঘোষক। সেই দীর্ঘ সময় তারা মিল্লাতে ইবরাহীমীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেখানে কোনো তাওরাত ছিল না; ছিল না কোনো ইহুদীবাদ। তারা ছিলেন তাওহীদের উপর অবিচল।

এক পর্যায়ে সম্রাট প্রথম আহমোস-এর হাতে হেকসোসদের পরাজয় ঘটে। এই পরাজয়ের পর হেকসোসরা মিসরের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত হয়। মিসরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় ফারাওরা। প্রথম আহমোস থেকে শুরু হয়ে অন্যান্য ফেরাউন ক্ষমতায় বসে। এ পর্যায়ে মিসরের ভূখণ্ডে ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা দেয়। ফারাও সম্রাটরা ধারণা করত যে, এসব বনী ইসরাইল হেকসোসদের সহযোগী। ফলে মিসরের ভূখণ্ডে তাদের উপর নেমে আসে নির্মম জুলুম-অত্যাচার। প্রায় ৩০০ বছর পর্যন্ত বনী ইসরাইলের উপর ফারাও সম্রাটদের এ নির্মম অত্যাচার চলতে থাকে। এ সময়ে বনী ইসরাইলের স্বভাব-চরিত্রে দেখা দেয় ব্যাপক পরিবর্তন। তাদেরকে সেই স্বভাবে নিয়ে আসে যে স্বভাবে আজ আমরা তাদেরকে চিনি। তাদের এ উদ্ভট স্বভাব আর চরিত্র পাল্টে দিয়েছে ইতিহাসের অনেক গতিধারা।

কীভাবে ফারাওরা বনী ইসরাইলের স্বভাব-চরিত্রের এ দশা করে?

বনী ইসরাইলের পক্ষ থেকে এর জওয়াব কী?

কখন মুসা ﷺ প্রেরিত হন? মিসরের তৎকালীন ফেরাউনের সাথে তার কী ঘটেছিল?

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে মুসা ﷺ-এর পরবর্তী ইতিহাস কী?

ফারাও শাসকবর্গ ও বনী ইসরাইল

আগে আমরা ইয়াকুব ﷺ-এর অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি। যখন তিনি পুত্র ইউসুফ ﷺ-এর আহ্বানে মিসরে হিজরত করেন; তাঁর সাথে তাঁর সন্তানাদি, নাতি-নাতনীসহ পুরো পরিবার ছিল। এভাবেই মিসরের ভূখণ্ডে বনী ইসরাইলের আগমন ঘটে। তারা প্রায় ১৫০ বছর হেকসোস শাসকদের অধীনে বসবাস করেন। হেকসোসদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মীয় স্বাধীনতা। দেশের অভ্যন্তরে ইয়াকুব ﷺ ও তাঁর সন্তানরা কোনো বাঁধা-বিঘ্ন ছাড়া তাওহীদের বাণী প্রচার করতে পারতেন। তখন তারা মিল্লাতে ইবরাহীমীর উপর অবিচল ছিলেন।

কিন্তু ইয়াকুব ﷺ-এর সন্তানদের মিসর গমনের ১৫০ বছর পর ফারাওরা হেকসোসদের পরাজিত করে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে সময়টি ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৫৫০ সাল। ফারাও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাট প্রথম আহমোসের নেতৃত্বে। শুরু হয় ফারাও শাসন। ফারাওরা বনী ইসরাইলকে হেকসোসদের সহযোগী মনে করত। ফলে মিসরের মাটিতে বনী ইসরাইলের উপর নেমে আসে চরম দূর্ভোগ। ধারাবাহিক দীর্ঘ ৩০০ বছর ধরে চলতে থাকে এই দুর্দিন। খ্রিস্টপূর্ব ১৫৫০ থেকে ১২৫০ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ মুসা ﷺ প্রেরিত হওয়া পর্যন্ত।

এই ৩০০ বছর বনী ইসরাইলের স্বভাব-চরিত্রে নিয়ে আসে বিরাট অধঃপতন। যে জনগোষ্ঠী জুলুম-নির্যাতন ও দমন-নিপীড়নের মধ্যে বেড়ে ওঠে, তারা স্থবির জাতিতে পরিণত হয়– যাদের কোনো ইচ্ছা, অভিমত, উচ্চাশা বা স্বপ্ন থাকে না। তাদের জীবন হয়ে পড়ে

CamScanner

গোলামের জীবন। বনী ইসরাইলের অবস্থাও এমনই দাঁড়ায়। তারা মানবেতর জীবন-যাপন করে। লাঞ্ছনা, ভীতি ও মিথ্যা হয়ে যায় তাদের জীবনসঙ্গী। দমনপীড়ন তাদেরকে একের পর এক মিথ্যা বলতে বাধ্য করতে থাকে। একপর্যায়ে এ নিকৃষ্ট স্বভাব তাদের মজ্জাগত হয়ে যায়। আর এই স্বভাবেই তারা প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে তাদের এই স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন–

> অতএব তাদের জন্য আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ– যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। [সুরা বাকারা :৭৯]

এরপর তারা একত্ববাদ ছেড়ে দিয়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে যায়। ডুবে যায় পৌত্তলিকতায়। এমনকি ফারাওদের মত গাইরুল্লাহর উপাসনা তাদেরও অস্তিত্বে মিশে যায়। ফারাওদের উপাস্য ছিল অনেক। কল্যাণের দেবতা, অকল্যাণের দেবতা, সৌন্দর্যের দেবতা, সমুদ্রের দেবতা ও নদী ইত্যাদির দেবতা। প্রতিটি বিষয়ের ছিল আলাদা আলাদা দেবতা। উপাস্যের এই ছড়াছড়ি এবং শিরকের এই মহামারী বনী ইসরাইলের মধ্যেও শিকড় গেড়ে বসে। অথচ আগে তারা ছিল মিল্লাতে ইবরাহীমীর উপর অটল-অবিচল। এই দীর্ঘ সময়ে বহু বিকৃতি আর অপব্যাখ্যা বনী ইসরাইলের মধ্যে সৃষ্টি হয়।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২৫০ সালের দিকে মুসা ﷺ প্রেরিত হন। এমন সময়ে মিসরে তাঁর জন্ম হয়, যখন তৎকালীন ফেরাউন– আল্লাহ ﷻ যেমন উল্লেখ করেছেন– মানুষকে গোলামে পরিণত করত; তাদেরকে দুর্বল করে রাখত; শিশুদের জবাই করত; নারীদের বাঁচিয়ে রাখত। এটা ছিল মানবতার এক বড় বিপর্যয়। আমাদের রব যেমন তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন–

> ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করত এবং নারীদের জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী। [সুরা কাসাস :৪]

ফেরাউন কাদের সন্তান জবাই করত? বনী ইসরাইলের সন্তান।

এমন পরিস্থিতিতে জন্মগ্রহণ করেন হারুন ﷺ এবং তিনি নিহত হওয়া থেকে বেঁচে যান। এরপর জন্ম নেন মুসা ﷺ। তার বেঁচে যাওয়ার ঘটনা আমরা সবাই জানি। কুরআনে যেমন আলোচিত হয়েছে। মুসা ﷺ ফেরাউনের ঘরেই বেড়ে ওঠেন। এরপর এক মিসরীকে হত্যার ঘটনা ঘটে। এবং মুসা ﷺ মিসর থেকে পালিয়ে মাদায়েন চলে যান। যা আমরা সবাই জানি।

এখানে একটু বিরতি নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছি। একটি মারাত্মক ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করতে চাই, বেশিরভাগ মিসরী যে ভুলে প্রায়ই নিপতিত হন। আমরা দেখতে পাই মিসরীরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ক্রীড়া সংক্রান্ত অনেক বিষয়েই ফারাও শাসকদের নিয়ে গর্ব করে থাকেন। বিষয়টি খুবই পরিতাপের। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে ফারাওদের অনেক স্মৃতি ও কীর্তি রয়েছে– একথা ঠিক; তবে ভুলে গেলে চলবে না যে, তারা ছিল মুশরিক। নবী-রসুলের বিপক্ষে তারা যুদ্ধ করেছিল। মুসা ও হারুন ﷺ-এর সাথে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল। এমন সব অপকর্ম করেছিল, যেগুলোর কথা আমাদের রব উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকে দিয়ে জুলুম ও ঔদ্ধত্যের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাদের সম্প্রদায়ের জীবনধারাও ছিল তাদের মতই। এমনকি আল্লাহ ﷻ তৎকালীন মিসরের জনগোষ্ঠীকে ফাসেক জনগোষ্ঠী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন–

> অতঃপর সে (ফেরাউন) তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, এবং তারা তার কথা মেনে নিল। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। [সুরা যুখরুফ : ৫৪]

অতএব, এমন কাউকে নিয়ে গর্ব করা থেকে বিরত হোন, যে গাইরুল্লাহর দাসত্ব করত। বিষয়টি ওই ব্যক্তির মত, যার বংশ আবু জাহল, আবু লাহাব বা ওয়ালীদ ইবনু মুগীরার সাথে মেলে বলে গর্ব করে। সে বলে, এসব ব্যক্তি ছিল আরব। আর একজন আরব হিসাবে আমি তাদের নিয়ে গর্বিত। সে গর্ব করে বেড়ায় পূর্ববর্তী আরব কাফেরদের নিয়ে। এটা কি কোনো বিবেকবানের কথা হতে পারে?

CamScanner

আলোচনার প্রেক্ষিতে মনে পড়ে গেল। বিশিষ্ট আলেম ড. আবদুল্লাহ আযযাম ﷺ উল্লেখ করেছেন যে, জর্ডানে এক নাস্তিকের ডাকনাম ছিল আবু লাহাব। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন আপনি নিজের উপনাম আবু লাহাব রেখেছেন?

সে জওয়াব দেয়, আমি একজন আরব। আরবদের নিয়ে আমি গর্বিত। আবু লাহাবও একজন আরব। তাকে নিয়েও আমি গর্ব করি।

কী আজব ব্যাপার! এ লোক সমগ্র আরবদের ছেড়ে গর্ব করার জন্য আবু লাহাবকে বেছে নিয়েছে। এটা একটা বিকৃত চেতনা। তবে কিছু সাধারণ মানুষও এই রোগে আক্রান্ত। আমি আশা করব, ভবিষ্যতে মিসরীরা ফারাওদের নিয়ে গর্ববোধ করবেন না। আমি আগেই বলেছি, কুরআনে ফারাওদের আলোচনা এসেছে অভিশাপ, লানত আর লাঞ্ছনার সাথে।

মুসা ﷺ 'উলুল আযম' মহান নবী মিসর থেকে বেরিয়ে পড়েন। দীর্ঘ সময় মাদায়েনে কাটান। এরপর আবার মিসর ফিরে আসেন। তাঁকে নবুওয়ত দেওয়া হয়। তিনি এসে ফেরাউনকে দাওয়াত দেন।

ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঠে যাদুকররা ঈমানদার হয়ে যায়। তিনি জনসম্মুখে অখণ্ডনীয় হুজ্জত পেশ করেন। সে সময় মিসরের সব অধিবাসীদের মধ্য থেকে মাত্র তিন/চার জন ঈমানদার হয়। ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া। ফেরাউনের সেবিকা এবং আরও একজন ঈমানদার হয়, যার কথা সুরা আল-মুমিনে উল্লেখ আছে। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে ফেরাউনের রাজপ্রাসাদের এক বাবুর্চিও ঈমান গ্রহণ করেছিল। মিসরের অবশিষ্ট জনগণের কেউই ওই সময় ঈমান আনেনি। এমনকি বনী ইসরাইলও না। সুরা ইউনুসে এর বিবরণ দিতে গিয়ে আমাদের রব বলেন–

> আর কেউ ঈমান আনল না মুসার প্রতি তাঁর কওমের কতিপয় বালক ছাড়া– ফেরাউন ও তার সর্দারদের ভয়ে যে, এরা না আবার কোন বিপদে ফেলে দেয়। ফেরাউন দেশময় কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল। আর সে তার হাত ছেড়ে রেখেছিল। [সুরা ইউনুস : ৮৩]

৩০০ বছর যাবৎ দমন, নিপীড়ন ও ভয়-ভীতিতে নিমজ্জিত বনী ইসরাইল মুসা ﷺ-এর অনুসরণ করতেও দ্বিধাবোধ করতে থাকে। এজন্য মুসা ﷺ তাদেরকে ঘরেই সালাত আদায় করার নির্দেশ দেন–

> আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মুসা এবং তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে বাসস্থান নির্ধারণ করো। আর তোমাদের ঘরগুলো বানাবে কেবলামুখী করে এবং সালাত কায়েম করো আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ দান করো। [সুরা ইউনুস : ৮৭]

তারা ছিল ফেরাউন ও তার সৈন্যদের ভয়ে ভীত। এভাবে কেটে যায় অনেক বছর। আল্লাহ ﷻ মিসরীদেরকে অনেক অলৌকিক নিদর্শন দিয়ে পরীক্ষা করেন। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে দেখানো হয় সুস্পষ্ট নয়টি অলৌকিক নিদর্শন। তবুও তারা ঈমান আনে না। জুলুম ও ত্রাসের উপর চলতে থাকে। একবার, দুইবার, তিনবার এমনকি নয় নয়বার তারা মুসা ﷺ-কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে। আমাদের রব যেমন উল্লেখ করেছেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ ﷻ তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দেন। এরপর তিনি মুসা ﷺ-কে তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে মিসর ত্যাগ করার অনুমতি দেন। মুসা ﷺ বনী ইসরাইলকে তার সাথে দেশ ত্যাগের প্রস্তাব দেন। তখন এক মহা প্রস্থান সংঘটিত হয়।

বনী ইসরাইল মিসর থেকে সুয়েজ উপসাগর অভিমুখে বেরিয়ে পড়ে। সুস্পষ্ট এক মুজিযার মাধ্যমে তারা উপসাগর অতিক্রম করে। এ মুজিযার মাধ্যমে মুসা ﷺ লালিত একীন এবং বনী ইসরাইলের ভীরুতা, দুর্বলতা ও হীনমন্যতা স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন আমাদের রব ﷻ উল্লেখ করেছেন–

> যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মুসার সঙ্গীরা বলল, আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম। [সুরা শুআরা : ৬১]

আল্লাহ ﷻ-এর সাহায্যের উপর তাদের কোনো বিশ্বাসই ছিল না। তখন মুসা ﷺ বলেন–

> কখনও নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। [সুরা শুআরা : ৬২]

CamScanner

এরপর মুসা ﷺ লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করেন। তখন দুইপাশ পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে মাঝখান দিয়ে রাস্তা হয়ে যায়। মুসা ﷺ বনী ইসরাইলকে নিয়ে সাগরে প্রবেশ করেন এবং পার হয়ে অপর প্রান্তে পৌঁছে যান। তাদের পেছনে পেছনে ফেরাউনও তার সর্বশক্তি নিয়ে প্রবেশ করে। সে ধ্বংস হয়ে যায়; ধ্বংস হয় তার সেনাবাহিনী। আল্লাহ ﷻ ফেরাউনের দেহ বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শনহিসাবে অক্ষত রাখেন। মিসরের ইতিহাসের বিভিন্ন সূত্রের বিবরণ মুসা ﷺ-এর কাহিনীর সাথে মিলে যায়। এই ঘটনা সংঘটিত হয় ফারাও সম্রাট দ্বিতীয় রামসিসের আমলে। তবে প্রকৃত সত্য আল্লাহ ﷻ-ই ভালো জানেন। তার দেহ আজও বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শনহিসাবে মমি আকারে অক্ষত আছে।

বড় আফসোসের বিষয়, আমরা অনেক মানুষকে দেখি দ্বিতীয় রামসিসকে দেখে তাজ্জব হয়। মমি সংরক্ষণ দেখে চমকে ওঠে। চত্বরে চত্বরে স্থাপিত বড় বড় ভাস্কর্য দেখে থমকে যায়। অথচ মানুষ চিন্তাও করে না যে, এ লোক এবং এর মত অন্যদের– চাই সে ফারাও সম্রাট দ্বিতীয় রামসিস হোক বা অন্যকেউ– আল্লাহ ﷻ ভয়ঙ্কর মুজিযা দিয়ে ধ্বংস করেছেন। তার দেহ অদ্যাবধি অক্ষত রেখেছেন, যেন তা বিশ্ববাসীর কাছে রব্বুল আলামীনের কুদরতের নিদর্শন হয়ে থাকে।

মুসা ﷺ ও তাঁর সম্প্রদায় যখন সিনাই পৌঁছে, তখন তাদের সাথে কী ঘটে?

দেখা যাক, বনী ইসরাইলরা কতজন মুসা ﷺ-এর সাথে সাগর পাড়ি দেয়?

মিসরের ভূখণ্ডে বনী ইসরাইলের অবস্থানের এ দীর্ঘ সময়ে তাদের জনসংখ্যা কতজন হয়েছিল?

কিছুকিছু গ্রন্থের ভাষ্য– ইসলামের তাফসীর-বিষয়ক গ্রন্থাবলিতেও এমন তথ্য রয়েছে– সাগর পাড়ি দেওয়া বনী ইসরাইলের সংখ্যা ছিল ৬ লাখ। কোনো কোনো বর্ণনা বলে, ৬ হাজার বা ১৫ হাজার। দ্বিতীয় বর্ণনাটি বেশি সঠিক বলে মনে হয়। আমার কাছে অনেক দলিল-প্রমাণ আছে, যেগুলো প্রমাণ করে যে, তৎকালীন বনী ইসরাইলের সংখ্যা ৬ লক্ষ হওয়াটা কিছুতেই বোধগম্য নয়। ইহুদীরা স্বভাবত সংখ্যা মোটা করে দেখায়, যাতে তারা বোঝাতে সক্ষম হয় যে, তারা এক বিরাট জনসংখ্যা নিয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করেছিল।

সুরা ইউনুসে আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আর কেউ ঈমান আনল না মুসার প্রতি তাঁর কওমের কতিপয় বালক ছাড়া– ফেরাউন ও তার সর্দারদের ভয়ে যে, এরা না আবার কোন বিপদে ফেলে দেয়। ফেরাউন দেশময় কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল। আর সে তার হাত ছেড়ে রেখেছিল। [সুরা ইউনুস : ৮৩]

কুরআনের এই বর্ণনাশৈলী প্রমাণ করে যে, তৎকালীন বনী ইসরাইলের জনসংখ্যা অধিক হওয়া অসম্ভব! ৬ লক্ষ তো বিরাট সংখ্যা। আরবী ভাষায় 'যুররিয়্যাহ' শব্দটি বলা হয় স্বল্পতা বোঝানোর জন্য। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে মুসা ﷺ-এর বাহিনীকে ধাওয়া করার সময় ফেরাউন নিজেই বলেছিল–

> নিশ্চয়ই এরা ক্ষুদ্র একটি দল। [সুরা শুআরা : ৫৪]

অর্থাৎ মুসা ﷺ-এর সহগামী বনী ইসরাইলের সংখ্যা খুবই কম।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে মিসর প্রবেশকালে বনী ইসরাইলের সংখ্যা কত ছিল? ইয়াকুব ﷺ-এর যুগে তাদের জনসংখ্যা ছিল কতজন? আমরা আগেই বলেছি, আনুমানিক ৭২ জন লোক নিয়ে ইয়াকুব ﷺ মিসর এসেছিলেন। ইয়াকুব ﷺ-এর ১২ সন্তান। সাথে ছিল তাদের স্ত্রীরা ও সন্তান-সন্ততি। তা হলে মাত্র ৪৫০ বছরের মাথায় (ইউসুফ ﷺ ও তার পরবর্তী হেকসোস শাকদের অধীনে ১৫০ বছর, ফারাও আমলের ৩০০ বছর। এ হল মধ্য ব্রোঞ্জ যুগ) ৭২ জন ব্যক্তি ৬ লক্ষ হয়ে যাবে? অসম্ভব একটা বিষয়। এ সময় বনী ইসরাইলরা মিসরীদের বিবাহ করতে পারত না। অর্থাৎ তৎকালীন বনী ইসরাইলের প্রত্যেক ব্যক্তি ছিল খাঁটি বনী ইসরাইল। সামনে আমরা দেখব ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে তাদের ভীতি। এই ভীতি প্রমাণ করে তাদের সংখ্যা তখন ৬ লক্ষ ছিল না।

আমরা আরও দেখব, তারা যখন ইউশা ﷺ-এর সাথে ফিলিস্তিন প্রবেশ করে, তখন জনশক্তির স্বল্পতার দরুণ সব জায়গা দখল করার

CamScanner

সামর্থ্যও তাদের ছিল না। এতেও প্রমাণিত হয়, তাদের জনসংখ্যা তেমন একটা বড় ছিল না।

মুসা ﷺ-এর সাথে তাদের সিনাই উপত্যকায় আসার পরবর্তী অবস্থা আমাদের রব বয়ান করেছেন। যখন তারা সিনাই উপত্যকায় আসে, তখন সেখানে তারা এক পৌত্তলিক সম্প্রদায় পায়। ওই সম্প্রদায় আল্লাহকে বাদ দিয়ে গাছের পূজা করত। বনী ইসরাইল তখন কি বলেছিল? দেখুন, সেই প্রজন্মের স্বভাব-চরিত্র, যারা লাঞ্ছনা, দাসত্ব আর জুলুম-নির্যাতনের মধ্যে বেড়ে উঠেছিল। তারা এমন এক জীবনে অভ্যস্থ হয়েছিল, যেখানে পৌত্তলিকতা ও নানান উপাস্যের ছিল ছড়াছড়ি। কাজেই গাছপূজারী সম্প্রদায় দেখে তারা যা বলে উঠেছিল, কুরআন মাজীদ তা উল্লেখ করেছে—

> আমি সাগর পার করে দিলাম বনী ইসরাইলকে। তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছল, যারা স্বহস্তনির্মিত মূর্তিপূজায় নিয়োজিত ছিল। তারা বলতে লাগল, হে মুসা! আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দাও। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে বড় অজ্ঞতা রয়েছে। [সুরা আরাফ : ১৩৮]

কয়েক মিনিট আগে আমাদের রব বনী ইসরাইলকে সুস্পষ্ট মুজিযার মাধ্যমে মহাবিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আল্লাহ প্রদত্ত মুজিযার মাধ্যমে যে সমুদ্র তারা পাড়ি দিয়ে এসেছে, তার পানি এখনও তাদের পা থেকে শুকায়নি; কিন্তু এখনই তারা মুসা ﷺ-কে বলছে, আমাদেরকে ওদের মত ইলাহ বানিয়ে দাও! তাই মুসা ﷺ তাদেরকে বলেন— নিশ্চয়ই তোমরা মূর্খ সম্প্রদায়। [সুরা আরাফ : ১৩৮]

এরপর ঘটে যায় অনেক ঘটনা। যেগুলো আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। মুসা ﷺ তাওরাত লিখিত 'লাওহ' (কাষ্ঠখণ্ড) গ্রহণ করতে তুর[৩] পাহাড়ে যান।

---

৩. তুর পাহাড় বর্তমান মিসরের সিনাই উপদ্বীপে অবস্থিত। মিসরের 'জানুব সিনাই' জেলার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ পাহাড় এটা। 'জাবালু মুসা' ও 'মাউন্ট সিনাই'

তুর পাহাড়ে গমনকালে তিনি বনী ইসরাইলকে আল্লাহর প্রেরিত একজন নবীর সাথে রেখে যান। তিনি হারুন ﷺ। এরপরও বনী ইসরাইল কী করেছিল? আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা বাছুর পূজা শুরু করে দিয়েছিল। মুসা ﷺ এদেরকে রেখে মাত্র ৪০ রাতের জন্য দূরে গিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি তাদেরকে ৩০ রাতের কথা বলেছিলেন। এরপর আরও ১০ রাত বাড়ানো হয়। এদিকে ৩০ রাত যেতে না যেতেই বনী ইসরাইল অবাধ্য হয়ে ওঠে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা বাছুর পূজা শুরু করে।

দেখুন মানসিকতা! দেখুন বিবেক!! এরাই পরবর্তীতে জন্ম দিয়েছে আমাদের পরিচিত আজকের ইহুদীদের। এরাই তারা, যারা বহু যন্ত্রণা দিয়েছিল মুসা ﷺ-কে। মুসা ﷺ তাঁর কওমে একদিনও শান্তি অনুভব করেননি সেই সময়, যখনকার কথা আমরা ভাবি যে, তাঁর সাথী-সঙ্গী অনেক সহায়তা করে থাকবেন। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তাদেরকে জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্ত করতে। অথচ তারাই তাকে সারা জীবন নিকৃষ্টতর কষ্ট দিয়েছে। হারুন ﷺ যখন তাদেরকে বাছুর পূজা থেকে বারণ করেন, তখন তারা হারুনকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়। আল্লাহ যেমন তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন—

> মুসা বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। [সুরা মায়েদা : ২৫]

আমরা যেমন তাদের ইতিহাস জানি যে, তারা পরবর্তীতে অনেক নবীকে হত্যা করেছিল।

এই পুরো কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের মধ্যে শুধু মুসা ও হারুন ﷺ-ই সত্যের উপর ছিলেন। আর ছিলেন মুসা ﷺ-এর

=নামেও পাহাড়টি পরিচিত। এই পাহাড়ে আল্লাহ ﷻ-এর সাথে মুসা ﷺ-এর কথোপকথন হত। উল্লেখ্য, এখানে তুর পাহাড় বলে ফিলিস্তিনের 'জাবালুত তুর' বা 'জাবালুত তবুর' উদ্দেশ্য নয়।

CamScanner

গোলাম ইউশা ইবনু নুন। আমরা জানি না, তিনি কি মুসা ﷺ-এর সাথে সাগর পার হয়ে এসেছিলেন, নাকি পরবর্তীতে সিনাই উপত্যকায় তাদের আটকে থাকার দিনগুলোতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বনী ইসরাইলই সেই ব্যর্থ জাতি, যারা সর্বপ্রথম কোনো নবীকে উপাসনার জন্য ইলাহ বানিয়ে দিতে বলেছিল। এরপর মুসা ﷺ যখন তার রবের কাছ থেকে 'লাওহ' আনতে যান, তখন তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সরাসরি বাছুর পূজা শুরু করে দেয়। মুসা ﷺ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসে বাছুরটি জ্বালিয়ে দেন। এরপর এদেরকে নিয়ে মুসা ﷺ আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নে পবিত্র ভূখণ্ড ফিলিস্তিনের দিকে যাত্রা করেন।

মুসা ﷺ সেই বনী ইসরাইলকে নিয়ে যাত্রা করেন, যাদেরকে রক্ষা করা হয়েছিল সুস্পষ্ট মুজিযার মাধ্যমে। তাদের সাথে ছিলেন আল্লাহর মদদপ্রাপ্ত রসুল। এক পর্যায়ে তারা পৌঁছে যায় ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে। শহরের প্রাচীরের সামনে তারা যাত্রা বিরতি করে। এরপর মুসা ﷺ তার কওমকে উদ্দেশ করে আল্লাহ ﷻ-এর নির্দেশ শোনান—

> হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভুমিতে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। [সুরা মায়েদা : ২১]

মুসা ﷺ বনী ইসরাইলকে অবগত করেন যে, আল্লাহ ﷻ তোমাদের জন্য এ ভূখণ্ড লিখে দিয়েছেন। কারণ, তোমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা ঈমানের পথ থেকে বিচ্যুত হও, তা হলে এ ভূখণ্ড আর তোমাদের থাকবে না। এটা নিঃশর্তভাবে শুধু মুমিনদের জন্যই। অতএব, যারাই আল্লাহর শরীয়ত আকড়ে ধরবে এ ভূখণ্ড তাদেরকে লিখে দেওয়া হবে। আর যারা আল্লাহর পথ থেকে সরে গিয়ে কুফরে লিপ্ত হবে তারা কিছুতেই এ ভূখণ্ডের হক দাবি করতে পারবে না—

> হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভুমিতে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে

প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। [সুরা মায়েদা : ২১]

বনী ইসরাইলের জওয়াব–

তারা বলল, হে মুসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিত আমরা প্রবেশ করব। [সুরা মায়েদা : ২২]

তা হলে এখানে দক্ষতা কোথায়? তারা বেরিয়ে যাওয়ার পর বনী ইসরাইল এসে প্রবেশ করবে। পরীক্ষা কোথায়? জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ কোথায়? কুরবানী ও আত্মত্যাগ কোথায়? এই ঈমান শুধু মুখের ঈমান! কাজ-কর্মের সাথে যার কোনো মিল নেই। তাদের এ কর্মকাণ্ড কি আদৌ গ্রহণযোগ্য? কুরআনের ভাষায়–

মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? [সুরা আনকাবুত : ২]

অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় বনী ইসরাইল মুসা ﷺ-কে জওয়াব দেয়–

তারা বলল, হে মুসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিত আমরা প্রবেশ করব। [সুরা মায়েদা : ২২]

এই প্রতাপশালী সম্প্রদায় কারা? তারা হল এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী কেনানী সম্প্রদায়। তারা ছিল পৌত্তলিক। ইহুদীদের এই ভূখণ্ডে আসার প্রায় ১৪০০ বছর আগ থেকে তারা এখানে বসবাস করে আসছিল। তারা ছিল শক্তিশালী যোদ্ধা জাতি। এজন্য ইহুদীরা উক্ত ভূখণ্ডে প্রবেশের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

অনেক ইসরাইলী বর্ণনা– খুব আফসোসের সাথে বলতে হয় যে, সেগুলো অনেক ইসলামী বই-পুস্তকেও বিদ্যমান রয়েছে– তৎকালীন

ফিলিস্তিনে বসবাসকারী এ সম্প্রদায় সম্পর্কে কত যে আজগুবি কথা বয়ান করে, তার ইয়ত্তা নেই। অনেক মুসলমান ওইসব কথা প্রচারও করে থাকেন। এসব বর্ণনা বলে, এরা ছিল আমালেকা সম্প্রদায়। এদের দেহ এমন ভারী আর দীর্ঘ ছিল যে, আমরা ধারণাও করতে পারি না। ইসরাইলী বর্ণনাতে আছে, ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে গিয়ে সংবাদ জানার জন্য মুসা ﷺ বনী ইসরাইলের কয়েক জন গুপ্তচর পাঠান। তারা এক আমালেকের কাছে ধরা পড়ে যায়। সে এদেরকে ধরে জামার হাতার মধ্যে ভরে ফেলে এবং সরদারের সামনে গিয়ে ঢেলে দেয়।

বিবেক লক্ষ্য করুন, আমালেকার লোকজনের দেহ এত বড় ছিল যে, একাধিক গুপ্তচরকে তারা জামার হাতার মধ্যে ভরে ফেলতে পারত।

তারা বলে থাকে, এ আমালেকা সম্প্রদায় উস (ইসু) ইবনু ইয়াকুব ইবনু ইসহাকের বংশধর। সে এই ভূখণ্ডেই বসবাস করত। উস ছিল 'আমলাক' তথা বিরাটকায়। সে যখন পানি পান করতে চাইত, তখন মেঘ নিংড়ে পানি বের করত। যখন খেতে চাইত, তখন সাগরে হাত ফেলত এবং মাছ ধরে আনত। এরপর সূর্যের দিকে হাত উঁচু করে সেই মাছ ঝলসে খেয়ে নিত। দেখুন, কী বিবেক। আফসোস, ইসলামী তাফসীরের গ্রন্থাদীতেও এসব অদ্ভুত কথা বিদ্যমান রয়েছে। এসব ইসরাইলী ভ্রান্ত বর্ণনা থেকে আমাদের তাফসীরের গ্রন্থগুলোকে পরিষ্কার করা উচিত।

এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে, কিছু কিছু তাফসীর গ্রন্থে এমন অবান্তর ইসরাইলী বর্ণনা কীভাবে এসেছে?

এসব কাহিনী বানানো হয়েছে, যাতে ইহুদীরা তাদের কাপুরুষতা ঢাকতে পারে। তারা যে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশ এবং সেখানে যুদ্ধসংক্রান্ত নববী নির্দেশ অমান্য করেছিল, তা যেন লুকাতে পারে। তারা তাদের নবীকে জওয়াব দিয়েছিল, এরূপ দৈত্যাকৃতির মানুষের সাথে কে যুদ্ধ করতে পারে?

কুরআনে বর্ণিত আছে–

> আল্লাহভীরুদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি বলল, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ করো। অতঃপর তোমরা যখন তাতে পবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা করো, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। [সুরা মায়েদা : ২৩]

বনী ইসরাইল কী জওয়াব দিয়েছিল? তারা জওয়াব দিয়েছিল—

> তারা বলল, হে মুসা, আমরা জীবনে কখনও সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানে বসলাম। [সুরা মায়েদা : ২৪]

'তারা যতক্ষণ সেখানে আছে আমরা কিছুতেই ঢুকব না।' দেখুন, তাদের বাক্যগুলো। এটা সুস্পষ্ট কুফর। 'আপনি এবং আপনার রব যান।' যেন আল্লাহ ﷻ শুধু মুসার রব; তাদের রব নন। মুসা ﷺ তখন তাদের কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন—

> হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে এবং এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। [সুরা মায়েদা : ২৫]

দেখুন, তাদের পুরো জনগোষ্ঠীর কী অবস্থা! একজন শক্তিশালী 'উলুল আযম' নবী মুসা ﷺ নিজের সম্প্রদায় নিয়ে মিসর ত্যাগ করেছিলেন। অথচ তিনি শুধু নিজের এবং হারুন ﷺ-এর উপরই ক্ষমতা রাখেন। খুব বেদনাহত হয়ে তিনি বলেছিলেন—

> হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে এবং এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। [সুরা মায়েদা : ২৫]

আল্লাহ ﷻ-এর ভাষ্যমতে ইহুদীরা ছিল ফাসেক। ফিলিস্তিন প্রবেশের প্রস্তাব তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা ছিল অত্যাধিক ভীরু, কাপুরুষ আর অবাধ্য। এজন্য আল্লাহ ﷻ তাদের ভাগ্যে লিখে দেন (তীহ তথা) সিনাই উপদ্বীপে পথ হারিয়ে উদভ্রান্তের মত ঘুরতে থাকার শাস্তি।

আল্লাহর পক্ষ থেকে বরাদ্দকৃত পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বনী ইসরাইল সিনাই উপদ্বীপে দুর্ভোগ-যন্ত্রণার মধ্যে ঘুরতে থাকে। যখনই তারা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের নিকটবর্তী হত, তখনই আল্লাহ ﷻ তাদের পথ ভুলিয়ে দিতেন। দিশেহারা হয়ে তারা বারবার ফিরে আসত। একবার, দুইবার, তিনবার, দশবার, বহুবার। এমনকি কখনও কখনও তারা ফিলিস্তিনের খুবই কাছে চলে যেত। কিন্তু তারপর আর পথ খুঁজে পেত না। এই সময়ে মুসা ﷺ ইন্তেকাল করেন। তিনি তাঁর রবের কাছে আবেদন করেছিলেন যেন তাকে পবিত্র ভূখণ্ডের নিকটবর্তী করে দেওয়া হয়। আল্লাহ ﷻ তাঁর আবেদন কবুল করেন। রসুল ﷺ-এর ভাষ্যমতে আল-কুদসের লাল টিলার কাছে তাকে দাফন করা হয়। আল-কুদসের এতটা নিকবর্তী হওয়ার পরও তারা পথ খুঁজে পায় না। কেননা, আল্লাহ ﷻ তাদের জন্য লিখে রেখেছিলেন 'তীহ' এর শাস্তি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এভাবেই বিভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা, গুমরাহী, লাঞ্ছনা ওইসব লোকের ভাগ্যে লিখে দেওয়া হয়, যারা আল্লাহর বিধান অবজ্ঞা করে। অবজ্ঞা করে তাদের রসুলের নির্দেশ এবং বর্জন করে নবীদের পথ।

আসুন দেখি, 'তীহ' প্রান্তরে বনী ইসরাইলের কি পরিণতি হয়?

যখন ইউশা ﷺ তাঁর কওমকে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে নির্দেশ দেন, তখন কী ঘটে?

আর সেখানে প্রবেশের কী ঘটে?

তীহ প্রান্তরে বনী ইসরাইল

আমরা মুসা ﷺ-এর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছি। এ ইতিহাসে আলোচিত হয়েছে অনেক কাহিনী, অনেক ঘটনা। এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম ইবরাহীম ﷺ-কে নিয়ে। এখন আমরা ফিলিস্তিনের ইতিহাসে অতিক্রান্ত কাহিনীমালা একসাথে পর্যালোচনা করে নেওয়া ভালো মনে করছি। এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় অব্যাহতভাবে অবশিষ্ট ইতিহাস পূর্ণ করব।

মানুষ যা আবিষ্কার করেছে, সেগুলো বিচারপূর্বক আমরা ফিলিস্তিনের প্রাচীন ইতিহাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছিলাম। সর্বাধিক প্রাচীন যুগকে আমরা প্রস্তর যুগ বলে আখ্যায়িত করেছি। যে যুগে কোনো খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হয়নি। আজ থেকে ১০ হাজার বছর আগে এই প্রস্তর যুগে দুনিয়ার প্রথম নগরী আরিহার গোড়াপত্তন হয়েছিল।

আমরা উল্লেখ করেছি, ফিলিস্তিনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল ব্রোঞ্জ যুগ। খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ সাল থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ২০০০ বছর হচ্ছে ব্রোঞ্জ যুগ। সে যুগে মানুষ টিন আবিষ্কার করে এবং টিন তামার সাথে মিলিয়ে ব্রোঞ্জে পরিণত করে। ফলে বিভিন্ন প্রকারের হাতিয়ার আবিষ্কার করা সম্ভব হয়।

আমরা ব্রোঞ্জ যুগকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগ, মধ্য ব্রোঞ্জ যুগ এবং আধুনিক ব্রোঞ্জ যুগ। প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তখন ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে প্রকৃত আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোর আবির্ভাব ঘটে। তারা সবাই আরব উপদ্বীপ থেকে এসেছিল। কেনানী, ফিনিশিয়ান, আমোরীয় ও জেবুসিট। এরাই ফিলিস্তিনের মাটিতে বেশিরভাগ শহর প্রতিষ্ঠা করে এবং তারা সবাই ছিল পৌত্তলিক।

CamScanner

এরপর ৪৫০ বছর ছিল মধ্য ব্রোঞ্জ যুগ। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৫৫০ সাল পর্যন্ত যার ব্যাপ্তি। এ সময়ে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে তাওহীদের আবির্ভাব ঘটে। ইবরাহীম ﷺ-এর আগমনের মাধ্যমে। ক্রমেই তাওহীদ বিস্তার লাভ করে। ইসমাঈল ﷺ এবং তারপর ইসহাক ﷺ-এর জন্ম হয়। ইসহাক ﷺ-এর ঔরসে জন্ম হয় ইয়াকুব ﷺ-এর।

এরপর ইউসুফ ﷺ-এর কাহিনীর সূচনা হয়। তাকে মিসর নিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার পর শুরু হয় তাঁর মিসরের জীবন। ইউসুফ ﷺ তার পরিবার-পরিজনকে মিসরে নিয়ে আসেন। সেখানে ইয়াকুব ﷺ-এর সাথে তারা ১২ ভাই জীবন-যাপন করতে থাকেন, যারা বনী ইসরাইলের মূল। তারা ১৫০ বছর বাস করেন, যা খ্রিস্টপূর্ব ১৫৫০ সালে শেষ হয়। এখানে মধ্য ব্রোঞ্জ যুগেরও সমাপ্তি।

আমরা আগে যেমন বলেছি, হেকসোসদের পরাজয় ঘটেছিল ফারাও সম্রাট প্রথম আহমোসের হাতে। তখন থেকে শুরু হয় নতুন ফারাও যুগ। পরবর্তী ৩০০ বছর, যেটা শেষ ব্রোঞ্জ যুগ– খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১২৫০ সাল পর্যন্ত। এটাই মুসা ﷺ-এর সময়। খ্রিস্টপূর্ব ১২৫০ সালে তিনি নবুওয়ত প্রাপ্ত হন। দীর্ঘ সময় ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের সাথে আল্লাহর পথে দাওয়াতের নবুওয়তী জীবন-যাপন করেন। এরপর ঘটে মহাপ্রস্থানের ঘটনা। মুসা ﷺ সিনাই উপদ্বীপে প্রবেশ করেন এবং পরিবার ও সম্প্রদায়কে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশে উৎসাহিত করেন। কিন্তু বনী ইসরাইল তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে তারা দিকভ্রান্ত হয়ে সিনাই উপত্যকার মরু অঞ্চলে ঘুরতে বাধ্য হয়। মুসা ও হারুন ﷺ তাদের সাথে সেখানেই জীবন-যাপন করতে থাকেন। এ সময় খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সালে মুসা ﷺ ইন্তেকাল করেন। বনী ইসরাইল সিনাই উপত্যকার ধু-ধু মরু প্রান্তরে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরতে থাকার এ সময়েই সমাপ্ত হয় আধুনিক ব্রোঞ্জ যুগ।

বনী ইসরাইল এতদিন পর্যন্ত মিল্লাতে ইবরাহীমীর উপর থেকে আল্লাহর এবাদত করছিল। সাগর পাড়ি দিয়ে আসার পর মুসা ﷺ তুর পাহাড়ে গমন করেন এবং তাওরাতের বোর্ড প্রাপ্ত হন। তাওরাতের বোর্ডে ছিল নতুন শরীয়তের বিধান। ইহুদীরা তখন নতুন শরীয়তে প্রত্যাবর্তিত হয়।

এরপর মুসা ﷺ ইন্তেকাল করেন। পবিত্র ভূখণ্ড দেখতে না পারায় তিনি ছিলেন মর্মাহত। পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশের প্রতি তিনি ছিলেন খুব উদগ্রীব। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে লাঞ্ছিত করে এবং তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ ﷻ তাদেরকে সিনাই উপদ্বীপের মরু প্রান্তরে ৪০ বছর উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরাতে থাকেন। এ সময়ের মধ্যে সেই প্রজন্মের মৃত্যু ঘটে, যারা লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, জুলুম ও নিপীড়ন সয়ে বেড়ে উঠেছিল। মিথ্যা যাদের আপদমস্তক ছেয়ে ফেলেছিল। যাদের অন্তরে পৌত্তলিকতার বিভিন্ন লক্ষণ শিকড় গেড়ে বসেছিল। আবার এর মধ্যে এমন এক প্রজন্মের আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে, যারা পূর্ববর্তী প্রজন্মের চেয়ে কিছুটা ভালো ছিল।

এই নতুন প্রজন্মও যেহেতু পূর্ববর্তী প্রজন্মের হাতে প্রতিপালিত হয়েছিল, এজন্য তারা পূর্ববর্তীদের অনেক নিকৃষ্ট স্বভাব উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে যায়। তবে এ প্রজন্মের মধ্যে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের কিছুটা হলেও আগ্রহ ছিল। ইউশা ইবনু নুন ﷺ এই নতুন প্রজেন্মের নবী মনোনীত হন। তাওরাতে তার নাম 'ইয়াশু' বলা হয়েছে। হাদীসে তাঁর কাহিনী আলোচিত হয়েছে। তবে কুরআনে তাঁর উল্লেখ নেই।

ইউশা ইবনু নুন ﷺ পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশের জন্য আহ্বান করেন এবং বনী ইসরাইল আরিহা শহর হয়ে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। তবে সেখানে প্রবেশের আগে তারা জর্ডান নদী ও জর্ডান ভূখণ্ড অতিক্রম করে।

তাদের পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশের দিনটি ছিল শুক্রবার। ইহুদীদের রীতি ছিল তারা শনিবার সবকিছু স্থগিত রাখত। তাই শুক্রবারেই তাদের যুদ্ধ শেষ করা ছিল আবশ্যক। কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘ হতে থাকে। এমনকি সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হয়। তৎকালে সৈন্যরা রাতে যুদ্ধ করত না। ওদিকে শনিবারও তারা যুদ্ধ করতে পারবে না, তাই তাদের পরাজয়ের সম্ভাবনা বাড়তে থাকে। ইউশা ইবনু নুন ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করেন, যেন সূর্য থেমে যায়, অস্তমিত না হয়। আল্লাহ ﷻ সূর্য থামিয়ে রাখেন। এটা ছিল বনী ইসরাইলের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন। এক পর্যায়ে বনী ইসরাইলের বিজয় হয়। এই তথ্য আমাদের রসুল ﷺ-এর সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে।

ঈমানদার ইহুদী বাহিনী ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিজয় অর্জন করে। এই প্রথম বারের মত যেনো তারা নবীর আনুগত্য প্রকাশ করে। কিন্তু পরক্ষণেই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। তাদের পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত অবাধ্যতা ও কুফর আবার তাদের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আল্লাহ ﷻ তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন অবনত হয়ে ফটক দিয়ে প্রবেশ করতে এবং 'হিততা' বলতে। অর্থাৎ আমাদের ভুলগুলো মিটিয়ে দিয়ে আমাদের ক্ষমা করে দিন।

কিন্তু তারা কি করেছিল? আল্লাহ ﷻ-এর নির্দেশ অনুপাতে তারা নত হয়ে প্রবেশ করেনি; বরং পিঠ দিয়ে প্রবেশ করে। অথচ তাদের উপর ফরজ ছিল নতশিরে সম্মুখপানে প্রবেশ করা। তারা মুখের কথাও বদলে ফেলেছিল। তাদের নবী ইউশা ﷺ-এর কথা ব্যাঙ্গ করে 'হিততা' (ক্ষমা চাই) শব্দের পরিবর্তে তারা 'হিনতা' (গম চাই) বলতে থাকে।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আর যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ করো এ নগরীতে এবং এতে যেখানে খুশি খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে থাকো এবং দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার সময় সেজদা করে ঢোকো, আর বলতে থাকো– আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও– তা হলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎ কর্মশীলদেরকে অতিরিক্ত দানও করব। [সুরা বাকারা : ৫৮]

কারা এরা?

এরা তারা, যারা একটু আগে একটি ঈমানী ক্ষেত্রে পৌত্তলিক শত্রুদের উপর বিজয়ী হয়েছিল। এরাই তারা, যাদের জন্য আল্লাহ ﷻ সূর্য থামিয়ে দিয়েছিলেন। এরাই তারা, চল্লিশ বছর উদ্ভ্রান্তের মত ঘোরার পর যাদের জন্য আল্লাহ ﷻ ইউশা ইবনু নুন ﷺ-কে প্রেরণ করেছিলেন। এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ ﷻ দেখিয়েছেন একের পর এক অসংখ্য অলৌকিক নিদর্শন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা, কুফর আর হঠকারিতাতে লিপ্ত থাকে। অথচ এই প্রজন্ম মুসা ﷺ-এর সময়কার

ফেতনাবাজ প্রজন্ম থেকে পরিচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু বনী ইসরাইল বলে কথা। তারা কুফর আর অবাধ্যতা ছাড়া কীভাবে থাকতে পারে?

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১১৯০ সালে ইউশা ইবনু নুন ﷺ ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন। মুসা ﷺ-এর ইন্তেকালের ১০ বছর পর। দীর্ঘকাল তিনি বনী ইসরাইলের নেতৃত্ব দেন।

যেমন রাজা-বাদশাহরা মানুষের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, তেমনই বনী ইসরাইলের নেতৃত্ব দিতেন নবী-রসুলগণ। যেমন রসুল ﷺ বলেছেন। যখনই তাদের কোনো নবী মারা যেতেন, তখনই আরেক জন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন।

ইহুদীরা ছিল খুবই বিশৃঙ্খলাপ্রবণ সম্প্রদায়। বনী ইসরাইলের মধ্যে নবীদের এমন আধিক্য কখনও তাদের ভালোর লক্ষণ নয়। মুসলমানদের মধ্যে শুধু একজন নবী প্রেরিত হয়েছেন। আজও তারা বিশুদ্ধ তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। যুগ যুগ ধরে বহু মানুষ সত্যকে সমুন্নত করে আসছেন। আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নত আকড়ে ধরে আছেন।

কিন্তু বনী ইসরাইলের কোনো নবী মারা গেলেই তারা অবাধ্য হয়ে উঠত। এমনকি নবীর জীবদ্দশায়ও তারা হঠকারিতা করত। কখনও কখনও তাদের কাছে আল্লাহ ﷻ একাধিক নবীও পাঠিয়েছেন। অধিক বিশৃঙ্খলার কারণে কখনও পাঠিয়েছেন একই সাথে তিনজন নবীকেও।

ইউশা ইবনু নুন ﷺ ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর জীবদ্দশায়ও বনী ইসরাইল একাধিকবার বিশৃঙ্খলা করে। এক পর্যায়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ ﷻ অপর একজন নবীকে প্রেরণ করেন। তারপর আরেকজন...।

ইউশা ইবনু নুন ﷺ-এর ইন্তেকালের পর ১৫০ বছর অতিক্রান্ত হয়। বনী ইসরাইলের অবাধ্যতা চরমে পৌঁছে। একপর্যায়ে আল্লাহ ﷻ তাদের উপর পৌত্তলিকদের চাপিয়ে দেন। পৌত্তলিকরা বনী ইসরাইলকে তখন এতটাই পর্যুদস্ত করে ফেলে যে, তাদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু 'তাবুত' পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

কি সেই তাবুত?

'তাবুত' একটি বিশেষ বাক্স। যাতে বনী ইসরাইল তাওরাতের ফলক, মুসা ﷺ-এর লাঠি ও আরও কিছু পবিত্র বস্তু রেখেছিল। এর উসিলা দিয়ে তারা বরকত কামনা করত। সব জায়গায় তারা এটা নিজেদের সাথে রাখত। যখন তারা আল্লাহর না-ফরমানী করে এবং দুনিয়াতে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তখন কেনানীরা তাদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী কেনানীরা তাদের থেকে তাবুতও ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এটা ছিল বনী ইসরাইলের জন্য চরম লাঞ্ছনার বিষয়। তাবুত হারিয়ে নিজেদের অধঃপতন তারা হাড়ে হাড়ে অনুভব করে।

ইউশা ইবনু নুন ﷺ-এর ইন্তেকালের ১০০ বছর পর তাদের মধ্যে আরও একজন নতুন নবীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর নাম ছিল 'সামুয়িল'। তবে আমরা নিশ্চিতভাবে তাঁর নাম জানি না। কেননা, তাঁর নাম কুরআন-হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। তবে তাওরাতে তার নাম সামুয়িল বলা হয়েছে। এই নতুন নবীর আবির্ভাব হলে বনী ইসরাইল তাঁর কাছে উপস্থিত হয়। তাবুত ফিরিয়ে আনতে তারা নবীকে জিহাদ করার আবেদন জানায়। কেনানীরা তাবুত ছিনিয়ে নেওয়ার ফলে তারা যে লাঞ্ছনার শিকার হয়, তার গ্লানী মুছতে তারা জিহাদ করতে চায়। কুরআনের ভাষায়–

> মুসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা তাদের নবীর কাছে গিয়ে বলল, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করে দিন, যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতি কি এমন ধারণা করা যায় না যে, লড়াইয়ের হুকুম যদি হয়, তা হলে তোমরা লড়বে না?

> তারা বলল, আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব না। অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হল, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়াল। আর আল্লাহ ﷻ জালেমদের ভালো করেই জানেন। [সূরা বাকারা : ২৪৬]

আল্লাহ ﷻ ইহুদীদের কাছে নতুন নবী প্রেরণ করেন। নবীর কাছে তারা জিহাদের আবেদন করে; কিন্তু যখন তাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হয়, তখন সামান্য কিছু বাদে সবাই পিছপা হয়ে যায়। অবশিষ্টদেরকে নবী বলেছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তালুতকে তোমাদের বাদশাহ করে পাঠিয়েছেন।

ইহুদীরা তালুতের সাথে কী আচরণ করে?

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে তার ইতিহাস কী?

বনী ইসরাইলের নতুন নবী তাদের কাছে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের আগ্রহ সম্পর্কে জানতে চান। তোমরা কেন যুদ্ধ করতে চাও? তোমরাই তো বছরের পর বছর তোমাদের দীনকে লাঞ্ছিত করে আসছ। তারা জওয়াব দেয়, আমাদেরকে আমাদের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তা হলে কেন আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। এরপর জিহাদ ফরজ করামাত্রই তাদের সুল্প সংখ্যক ছাড়া সবাই পিছপা হয়ে যায়। শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আগেই তারা এ কাণ্ড ঘটিয়ে বসে।

তাদের নবী তাদেরকে বলেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ হিসাবে পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ ইহুদীদের সেনাপ্রধান হিসাবে আল্লাহ ﷻ তালুতকে নির্বাচন করেছেন।

দেখুন, তাদের জওয়াব। তারা কী বলেছিল নবীর উদ্দেশে?

কুরআনের ভাষ্যমতে তারা বলেছিল–

> আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালুতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল,

> তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশি। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা করেন। আর আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত। [সূরা বাকারা : ২৪৭]

ইহুদীদের একটি শাখার নাম ছিল 'লেভি'। এই শাখা নবুওয়াতের উত্তরাধিকারী হত। আরেক শাখার নাম ছিল 'ইয়াহুযা'। তারা রাজত্বের উত্তরাধিকারী হত। ইয়াহুযা ও লেভি উভয়ই ছিল ইয়াকুব ﷺ-এর সন্তান। এদিকে তালুত ছিলেন বিনইয়ামিন ইবনু ইয়াকুবের বংশধর। বনী ইসরাইলকে পরীক্ষা করার মানসে আল্লাহ তাকে নির্বাচন করেছিলেন। তিনি ইয়াহুযা শাখার লোক না হওয়ায় বনী ইসরাইল তাকে নেতৃত্ব প্রদানের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। তারা একটি অবান্তর প্রশ্ন তোলে। তাকে তো ধন-সম্পদের ঐশ্বর্য দেওয়া হয়নি। কেমন যেন তিনি ধনী হলে তারা তাকে মেনে নিত। কিন্তু তিনি দরিদ্র। আবার তিনি রাজবংশেরও নন। তা হলে কিভাবে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করবেন? এ বিষয়টি সেনাবাহিনীর মধ্যে মারাত্মক সংশয় সৃষ্টি করে এবং বড় এক সংখ্যা যুদ্ধ থেকে পিছপা হয়ে যায়।

তালুত বনী ইসরাইলের স্বল্প সংখ্যক লোক নিয়েই বেরিয়ে পড়েন। পথে একটি নদী পড়ে। আপনারা সবাই জানেন যে, এই নদীর কাছে গিয়ে বনী ইসরাইল পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। তালুতের নির্দেশ অমান্য করে তাদের বেশিরভাগ নদীর পানি পান করে। যারা এ নদীর পানি পান করে, তারাও যুদ্ধ থেকে ছিটকে পড়ে। ফলে যৎসামান্য সৈন্য তালুতের সাথে অবশিষ্ট থাকে।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমরা নিজেদের সংখ্যা তালুতের সৈন্যসংখ্যার সমপরিমাণ বিবেচনা করতাম। বদর যুদ্ধের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ বা ৩১৪ জনের মত। হাদীসে বর্ণিত সর্বোচ্চ সংখ্যা ৩১৭। এ পরিমাণ লোকই তালুতের সাথে অবশিষ্ট

ছিল। একটি পরিপূর্ণ জাতির হাজার হাজার জনসংখ্যা থেকে মাত্র তিনশতাধিক লোক। তারপর তালুতের সাথে যারা অবশিষ্ট ছিল, তাদেরকে যখন জালুতের নেতৃত্বে আগত জালেম কাফের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়, তারাও তার নির্দেশ ফিরিয়ে দেয়। তারা জওয়াব দেয় (কুরআনের ভাষায়)—

> অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ করবে না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে, তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালুত যখন তা পার হল এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালুত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বার বার বলতে লাগল, কত ছোট দল বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। [সুরা বাকারা : ২৪৯]

এ তিনশতাধিক বনী ইসরাইলের মধ্য থেকে মাত্র একজন লোক অগ্রসর হন। তিনি হলেন, দাউদ ﷺ। (ফিলিস্তিন নিয়ে) আমাদের ইতিহাস বর্ণনায় এই প্রথম দাউদ ﷺ-এর নাম এল। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ১০২৫ সালে। দাউদ ﷺ-এর বয়স তখন মাত্র ১৬ বছর। তখন তাঁর সাথে ছিল একটি গুলতি। আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি জালুতকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। নিহত হয় আল্লাহর দুশমন জলুত। দাউদ ﷺ, তালুত ও স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের হাত ধরে ঈমানের বিজয় হয়।

দাউদ ﷺ দীর্ঘ সময় পূর্ব বর্ণিত নবী সামুয়িল-এর সাথে জীবন-যাপন করেন। সামুয়িল-এর মৃত্যুর পর দাউদ ﷺ নবুওয়তপ্রাপ্ত হন এবং বনী

ইসরাইলের নেতৃত্ব দেন। খ্রিস্টপূর্ব ১০০৪ সালে দাউদ ﷺ ফিলিস্তিনের একাধিক শহরে প্রবেশ করেন। সেগুলোর মধ্যে আল-কুদস শহর অন্যতম। তিনি সর্বজন পরিচিত ইহুদী সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। ইহুদীদের সমগ্র ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য। দাউদ ﷺ এ সাম্রাজ্য শাসন করেন।

এখানে আমরা একটি কথা বলে রাখার প্রয়োজন অনুভব করছি। তা হল, দাউদ ﷺ যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, তা ফিলিস্তিনের ২০ হাজার বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ড জুড়ে বিস্তৃত ছিল। আর ফিলিস্তিনের মোট আয়তন ২৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার। অর্থাৎ ফিলিস্তিনের মোট আয়তনের ৭৪%। এর মানে হল ইহুদীদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যও ফিলিস্তিনের ৭৪% ভূখণ্ডের অধিক অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি।

ইতিহাসের পাতায় এটাই ছিল ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে প্রকৃত ঈমানের প্রথম আধিপত্য। ইবরাহীম ﷺ-এর সময় এ ভূখণ্ডে ঈমানের আলো প্রজ্জ্বলিত হলেও তা ঈমানের আলোকে শাসিত হত না। তিনি শুধু দাওয়াত ইলাল্লাহর অনুমতিই পেয়েছিলেন। সেটা ছিল পৌত্তলিক হেকসোসদের শাসনামল। ইউশা ইবনু নুন ﷺ যখন পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন, তখন তিনিও খুব বেশি জায়গায় আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হননি। তিনি আরিহা প্রবেশ করেছিলেন এমন একটি বাহিনী নিয়ে, প্রকৃত ঈমান থেকে যারা ছিল অনেক দূরে। প্রথম বারের মত ঈমানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় দাউদ ﷺ-এর সময়ে। সেই ঈমানী শাসন খ্রিস্টপূর্ব ১০০৪ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৯৬৩ সাল পর্যন্ত মোট ৪০ বছর স্থায়ী হয়।

দাউদ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তার সন্তান সুলাইমান ﷺ তাঁর উত্তারাধিকারী মনোনীত হন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> সুলাইমান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, হে লোক সকল, আমাকে উড়ন্ত পক্ষীকূলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে দেওয়া হয়েছে সব কিছু। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব। [সুরা নামল : ১৬]

সুলাইমান ﷺ-এর সময়টি ছিল ইহুদী সাম্রাজ্যের শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির যুগ। সুলাইমান ﷺ তাঁর পিতার অধিকৃত সমগ্র ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করেন। আমরা দেখতে পাই কুরআন বিভিন্ন জায়গায় সুলাইমান ﷺ-এর শক্তির উল্লেখ করে; কিন্তু সেটাকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করে। যেমন, কুরআন বলে, 'তিনি তার অনুগত করে দিয়েছেন...' বা 'আমি (আল্লাহ) তার অধীন করে দিয়েছি...'। ঈমান ও শরীয়তের জন্য ইহুদীদের কোনো সহযোগিতার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। কুরআনে শুধু পাখি, জিন, বায়ু প্রভৃতির আলোচনাই এসেছে। বনী ইসরাইল সুলাইমান ﷺ-এর দাপট ও প্রভাবের কাছে বশীভূত ছিল। তবে সন্দেহ নেই তাদের অন্তর ছিল হিংসা, বিদ্বেষ, অবাধ্যতা ও কুফরে পরিপূর্ণ। সুলাইমান ﷺ-এর ইন্তেকালের পরই যা প্রকাশ পেয়েছিল। সুলাইমান ﷺ-এর ইন্তেকালের পরপরই তারা তাদের আগের অবস্থায় ফিরে যায়। নবীদেরকে প্রদত্ত অঙ্গীকার তারা ভঙ্গ করে।

খ্রিস্টপূর্ব ৯৬৩ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৯২৩ সাল পর্যন্ত মোট ৪০ বছর ছিল তাঁর শাসনামল। সুলাইমান ﷺ-এর এ শাসনামলকে ঘিরেই রচিত হয়েছে হাজার হাজার কল্পকাহিনী ও বানোয়াট কিচ্ছা। আজ পর্যন্ত সেই মিথ্যা অব্যাহত রয়েছে।

ওইসব বানোয়াট কল্প-বাহিনীর মধ্যে হয়তো সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ 'সুলাইমানি টেম্পল' কাহিনী। ইহুদীরা আজও সেই টেম্পল খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা যেসব জায়গায় এই মন্দির খুঁজে বেড়ায়, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মসজিদে আকসার তলদেশ। আমরা মনে করি, এটা মসজিদে আকসা ধ্বংস করার একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। ইহুদীরা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মসজিদে আকসার তলদেশে যে পরিমাণ খননকার্য চালিয়েছে তাতে যে কোনো সময় মসজিদটি ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিঃসন্দেহে টেম্পলেরে এই কাহিনী সম্পূর্ণ বানোয়াট। কেননা, রসুল ﷺ বিষয়টি আলোচনা করেছেন—

> আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ বলেন, যখন সুলাইমান ইবনু দাউদ ﷺ বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণকার্য শেষ করেন, তখন আল্লাহর কাছে তিনি তিনটি বিষয়ের আবেদন জানান...। [ইবনু মাজাহ : ১৪০৮]

সুলাইমান ﷺ যে কাজটি করেন, তা হলো বাইতুল মুকাদ্দাসের ভিত্তি পুনরায় উত্তোলণ ও নব নির্মাণ। তিনি সেই মসজিদে আকসা-ই পুনঃনির্মাণ করেন, যা আজও আমাদের সামনে বিদ্যমান। সেখানে টেম্পল নামে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

তাওরাতে ও ইহুদী পণ্ডিতদের মধ্যেও কথিত টেম্পলের অবস্থান ও আকৃতি নিয়ে অনেক মতানৈক্য ও ধোঁয়াশা রয়েছে। কেউ বলেন, সেই টেম্পল পাথর দ্বারা নির্মিত। কেউ বলেন, খাটি স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত। কেউ বলেন, স্বর্ণখচিত তামা দ্বারা নির্মিত।

এর অনুসন্ধানে ইহুদী পণ্ডিতরা এবং আরও অনেকে প্রচুর খননকার্য চালিয়েছে। কিন্তু আজও টেম্পলের কোনো নাম-নিশানা তারা পায়নি। বাস্তবে বিষয়টি নিতান্তই কল্পনা। সুলাইমান ﷺ-এর ব্যাপারেও অনেক স্পর্যকাতর ও অবান্তর কথাবার্তা বলা হয়ে থাকে। অথচ তিনি ছিলেন বনী ইসরাইলেরই একজন মহান নবী, যার শাসনামল নিয়ে তারা গর্ব করে থাকে। প্রিয় পাঠক! তা হলে ওইসব নবী সম্পর্কে তারা কী বলতে পারে বলে মনে করেন, যারা বনী ইসরাইলের দুঃসময়ে আগমন করেছিলেন?

এখানে আমি সেই কথাটি পুনরাবৃত্তি করব, যা আমি আলোচনার শুরুতে বলে এসেছি– আমরা তাদের চেয়ে তাদের নবীদের বেশি আপনজন। আমরা বনী ইসরাইলের নবীদের বেশি আপনজন বনী ইসরাইলের চেয়ে। কেননা, আমরাই আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত নবীকে যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করি।

সুলাইমান ﷺ-এর ইন্তেকালের পর ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে কি ঘটে?

এ বিশাল সাম্রাজ্যের কী পরিণতি হয়, যা তিনি ও তাঁর পিতা গড়ে তুলেছিলেন?

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে পরবর্তীতে গড়ে ওঠা গ্রিক, রোমান অন্যান্য সাম্রাজ্য ইহুদীদের সাথে কী আচরণ করে?

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ইহুদী সম্প্রদায়

আমরা দীর্ঘ সময় ইহুদী সাম্রাজ্যের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলাম। যা গড়ে তুলেছিলেন দাউদ ও সুলাইমান ﷺ। আমরা উল্লেখ করেছি যে, এ সাম্রাজ্য প্রায় ৮০ বছর ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড শাসন করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১০০৪ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৯২৩ সাল পর্যন্ত। ইহুদীদের সমগ্র ইতিহাসে এটাই পরিপূর্ণ ঈমানী শাসনের সময়কাল। আমরা দেখেছি, মুসা ﷺ-এর যুগে বনী ইসরাইলের চরম বিপর্যয়। বিপর্যয় দেখেছি, ইউশা ইবনু নুন ﷺ-এর সময়ে এবং ইউশা ইবনু নুন ﷺ-এর ১৫০ বছর পর প্রেরিত নবী সামুয়িলের সময়েও। তাদের অধিকাংশ লোকই ফেতনা-ফাসাদ করেছে এবং তালুতের বাহিনীতে অংশগ্রহণ করেনি। একপর্যায়ে ছোট্ট বালক দাউদের হাতে আল্লাহ ﷻ তাদের বিজয় দান করেন। পরবর্তীতে দাউদ ﷺ-কে নবুওয়ত দেওয়া হয়। এরপরই সেই সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে, যে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। যা ফিলিস্তিনের মূল আয়তনের মাত্র ৭৪% ভূখণ্ড জুড়ে বিস্তৃত ছিল। ফিলিস্তিনের পুরো ভূখণ্ড এ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

খ্রিস্টপূর্ব ৯২৩ সালে সুলাইমান ﷺ-এর ইন্তেকালের পর এ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার বদ অভ্যাসগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দীর্ঘ সময় যারা সুলাইমান ﷺ ও তাঁর আগে দাউদ ﷺ-এর শক্তির কাছে বশীভূত ছিল। তাদের অন্তরে কখনও ঈমান বদ্ধমূল হয়নি। এজন্য শুধু সুলাইমান ﷺ-এর মৃত্যুর সুযোগেই তারা আবার তাদের আগের অবস্থানে ফিরে যায়। উত্তম ও প্রশংসনীয় সব কিছু পরিত্যাগ করে তারা আবার বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হয়।

আমরা জানি, ইয়াকুব ﷺ-এর ছিল ১২ ছেলে। সেই ১২ জন থেকেই বনী ইসরাইলের ১২টি শাখা গোত্রের উৎপত্তি। ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য ও বিভক্তিতে লিপ্ত হয়ে ১০ গোত্র একজনের নেতৃত্বে সমবেত হয়। অপর ২ গোত্র সমবেত হয় আরেকজনের নেতৃত্বে। ১০ গোত্রের মিলিত জোট উত্তর ফিলিস্তিনে গড়ে তোলে ইসরাইলী সাম্রাজ্য। সুলাইমান ﷺ-এর ইন্তেকালের পরপরই এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। বাকি দুই গোত্র মিলে দক্ষিণ ফিলিস্তিনে গড়ে তোলে ইয়াহুযা সাম্রাজ্য। এই দুই গোত্র ছিল ইয়াহুযা ও বিনইয়ামীনের বংশধর। উভয় সাম্রাজ্যের সমস্যা ছিল অভিন্ন। অভিন্ন বিশৃঙ্খলা আর পৌত্তলিকতা ছিল উভয় সাম্রাজ্যে। আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে তারা। কেনানীরা যেসব দেবতার পূজা করত, সিরিয়া, লেবানন ও আশপাশের ফিনিশিয়ানরা যেসব দেবতার আরাধনা করত, সুলাইমান ﷺ-এর মৃত্যুর সাথে সাথে বনী ইসরাইলও সেগুলোর উপাসনা শুরু করে দেয়।

উত্তর ফিলিস্তিনে ইসরাইল সাম্রাজ্য ২০২ বছরের জন্য টেকসই হয়। ফিতন-ফাসাদ, মতানৈক্য, অবাধ্যতা, জুলুম ও সীমালঙ্ঘন ছিল সেই সাম্রজ্যের মজ্জাগত বিষয়। এজন্য আল্লাহ ﷻ তাদের উপর অ্যাসিরিয়ানদের চাপিয়ে দেন। অ্যাসিরিয়ানরা ছিল ইরাকের অধিবাসী। খ্রিস্টপূর্ব ৭২১ সালে তারা হামলা করে। এবং ইসরাইল সাম্রাজ্য তছনছ করে দেয়। এই সাম্রাজ্যের অধিকাংশ ইসরাইলীকে তারা বন্দী করে নিয়ে যায়। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে তাদেরকে দাস হিসাবে বিক্রি করে ছড়িয়ে দেয়। এভাবে দশগোত্রের ইহুদীরা দুনিয়ার ইতিহাস থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর ইতিহাসের কোথাও এই দশ গোত্রের ইহুদী বলে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে বাকি থাকে দক্ষিণ ফিলিস্তিনের ইয়াহুযা সাম্রাজ্য। যা বিনইয়ামিন ও ইয়াহুযা গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল।

আমরা উল্লেখ করেছি যে, বনী ইসরাইলের রাজত্ব ছিল ইয়াহুযা গোত্রের মধ্যে। তাই বনী ইসরাইল নিজেদেরকে ইয়াকুব ﷺ-এর পুত্র ইয়াহুযার দিকে সম্বন্ধ করে 'ইয়াহুযী' বা 'ইয়াহুদী' পরিচয় দিয়ে থাকে। এই নাম মুসা ﷺ-এর সময়ে পরিচিত ছিল না। অন্যান্য নবীদের যুগেও না। ইয়াহুযা সাম্রাজ্য ইসরাইল সাম্রাজ্যের চেয়েও

দীর্ঘস্থায়ী হয়। আরও ১৫০ বছর বা তারও বেশি সময় তা টিকে থাকে। নির্ধারিত করে বললে, খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সাল পর্যন্ত।

এরপর আল্লাহ ﷻ তাদের উপর লেলিয়ে দেন এমন এক সম্প্রদায়কে যারা এ রাজ্যকে তছনছ করে দেয়। কেননা, ইহুদীরা দীর্ঘকাল থেকে না-ফরমানী করে আসছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৭ সালে ইরাক থেকে আল্লাহ ﷻ এক কওম প্রেরণ করেন। তারা ইয়াহুযা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। পুরো সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেওয়ার হুংকার দেয়। কিছু জনপদ তারা তখনই ধ্বংস করে দেয়। এবং এ সাম্রাজ্য থেকে প্রায় ১০ হাজার ইহুদীকে বন্দী করে ইরাকের ব্যাবিলন শহরে নিয়ে যায়।

এ লাঞ্ছনাকর দাসত্ব ও বন্দীত্ব সত্ত্বেও তারা আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপাচার অব্যাহত রাখে। ফলে খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সালে আল্লাহ ﷻ তাদের উপর দ্বিতীয় ধ্বংসযজ্ঞ চাপিয়ে দেন। এ ধ্বংসলীলার সেনাপতি ছিল 'নেবুচাদনেজার'। কোনো কোনো বর্ণনায় তার নাম এসেছে 'বখতনসর'। বখতনসর ছিল ইরাকের ব্যাবিলনদের সেনাপতি। সে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড থেকে ইহুদীদের নাম নিশানা পুরোপুরি মিটিয়ে দেয়। ইয়াহুযা সাম্রাজ্য তছনছ করে ফেলে। মসজিদে আকসা ধ্বংস করে ফেলে, যাকে তারা টেম্পল বলত। এ ধ্বংসলীলার পর প্রায় ৪০ হাজার ইহুদী নিয়ে সে ফিলিস্তিন ত্যাগ করে। ইতিহাসে এ অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয় দ্বিতীয় ব্যাবিলন বন্দীদশা। এর মাধ্যমে ইহুদী সাম্রাজ্যের পরিপূর্ণ পতন সম্পন্ন হয়।

এ পতনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে তৎকালীন ইহুদী শাসনের সমাপ্তি ঘটে, যা খ্রিস্টপূর্ব ১০০৪ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪১৮ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এর মধ্যে ৮০ বছর ছিল ঈমানী শাসন। দাউদ ও সুলাইমান ﷺ ও তাঁদের সৈন্যবলের সামনে ইহুদীরা তা মেনে নিতে বাধ্য ছিল। তখনও তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না। এরপর ৩৩৮ বছর ইহুদীরা শাসন করে ফেতনা-ফাসাদ ও জুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে। নবীদের উপস্থিতিতেও তারা পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হত। এমন কি তারা অনেক নবী-রসুলকে হত্যাও করে। আল্লাহর কিতাব ও প্রিয় নবী ﷺ-এর হাদীস দ্বারা যা প্রমাণিত।

CamScanner

বখতনসর ইহুদীদের উপর ধ্বংসলীলা চালানোর দীর্ঘকাল পর তারা আবার ফিলিস্তিনে ফিরে আসে। তবে ফিলিস্তিনের শাসকবেশে ফিরে আসতে পারেনি। মোটকথা, ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে তাদের ঈমানী শাসন ছিল মাত্র ৮০ বছর। ইহুদীরা এ ভূখণ্ডে তাদের অগ্রাধিকার ও মালিকানাসহ সকল দাবি-দাওয়ার ক্ষেত্রে এই ৮০ বছরের শাসনামলের উপর নির্ভর করে। তারপরও দেখুন, এই ঈমানী যুগে যারা এ ভূখণ্ড শাসন করেছেন সেই মহান নবী-রসুলের ব্যাপারে তারা কী সব অবান্তর কথা বলে থাকে।

যাইহোক, বখতনসরের ধ্বংসলীলার পর ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের বাকি বনী ইসরাইল মিসর পালিয়ে যায়। তাদের বেশিরভাগকে আগেই বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রথম বন্দীত্বের সময় ১০ হাজার। দ্বিতীয় বন্দীত্বের সময় ৪০ হাজার।

এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা হচ্ছে এসব ইহুদী ইরাকের ভূখণ্ডে যাওয়ার পর তাওরাত সংকলন শুরু করে। যখন তারা তাওরাত সংকলন শুরু করে, তখন থেকে মুসা ﷺ-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত সময়ের দূরত্ব প্রায় ৭০০ বছর। চিন্তা করুন, নাযিল হওয়ার পর ৭০০ বছর পর্যন্ত তাওরাতের সংকলন হয়নি। তার মানে এই দীর্ঘ সময় তাদের সামনে তাওরাত ছিল না। কারণ, তাবুত ও তাওরাতের ফলকসমূহ চুরি হয়েছিল। তাদের কাছে শুধু কিছু স্মৃতিকথা ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যেগুলো তারা পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করত। এবার ভেবে দেখুন, তাওরাতে কী পরিমাণ বিকৃতি ঘটতে পারে? বিশেষত যখন তা মিথ্যাবাদী ভবঘুরে ইহুদীদের হাতে পড়েছে। উপরন্তু তারা দুই-এক বছরে এর লেখা সম্পন্ন করেনি; বরং ধারাবাহিক ৪০০ বছর পর্যন্ত লিখে তাওরাতের বর্তমান রূপ দাঁড় করিয়েছে।

সুতরাং এখানে এমন একটি গ্রন্থের কথা আলোচনা করা হচ্ছে বিবেক ও দলিল-প্রমাণের আলোকে যা বিশুদ্ধ হওয়া একেবারে অসম্ভব। বিশেষ করে সুস্থ বোধ থেকে দূরত্ব এবং নবীদেরকে অভিযুক্ত করার পর তা কীভাবে সম্ভব হতে পারে। এর শ্লোকে শ্লোকে সংঘর্ষ, এক বক্তব্যের সাথে আরেক বক্তব্যের অমিল, আগের অংশের সাথে পরের

অংশের সমন্বয়হীনতা এবং দুর্বল উপস্থাপনসহ অসংখ্য অসঙ্গতি রয়েছে বিকৃত এই গ্রন্থে।

আল্লাহ ﷻ কুরআনের একটি আয়াতে ইহুদীদের উল্লিখিত বিপর্যয়ের কথা এভাবে তুলে ধরেছেন–

> অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময় এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। [সুরা বনী-ইসরাঈল :৫]

অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, এখানে বনী ইসরাইলের প্রথম ফেতনা-ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা ও ঔদ্ধত্য উদ্দেশ্য, যা সুলাইমান ﷺ-এর পরে ঘটেছিল। এই ফেতনা-ফাসাদের কারণে আল্লাহ ﷻ তাদের উপর বখতনসরকে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তারা বনী ইসরাইলের উপর ধ্বংসলীলা চালায়। তাদের শক্তি ও রাজত্ব নিঃশেষ করে দেয়।

কতিপয় মুফাসসিরের মতে এ বিপর্যয় বখতনসরের মাধ্যমে হয়নি। কেননা, আল্লাহ ﷻ তাদেরকে 'ইবাদান লানা' বা 'আমার বান্দাগণ' বলেছেন। আর বখতনসর ছিল পৌত্তলিক। আল্লাহর মুমিন বান্দা ছিল না।

আমরা বলব, কোনো জালেম কর্তৃক আল্লাহ ﷻ-র এবাদত প্রত্যাখ্যান তার বান্দা হওয়ার বৈশিষ্ট্য নাকচ করে না। সর্বাবস্থায় সে আল্লাহর বান্দা। সে স্বীকার করুক বা না করুক। আমরা সবাই আল্লাহর বান্দা। চাই সে অবাধ্য হোক বা অনুগত। কাফের হোক বা মুমিন।

তাছাড়া আল্লাহ ﷻ 'আমার বান্দা' বলেছেন, 'আমার ইবাদাতকারী' বলেননি।

এ ক্ষেত্রে উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ-এর বাণীতে একটি সুন্দর ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি ছিলেন একজন ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তি। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য ইরাক অভিমুখে মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণের সময় বলেছিলেন–

> তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যাচ্ছ। তোমরা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ো না এবং একথা বলো না যে শত্রুরা যেহেতু আমাদের চেয়ে খারাপ, তাই তাদেরকে আমাদের উপর লেলিয়ে দেওয়া হবে না। আল্লাহ ﷻ বনী ইসরাইলের উপর অগ্নিপূজকদের লেলিয়ে দিয়েছিলেন। তারা ছিল কাফের। আর বনী ইসরাইল ছিল আল্লাহর এবাদাতকারী। যখন বনী ইসরাইল দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা করেছিল। শত্রুরা জনপদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। আর এ ছিল কার্যকর ওয়াদা। [আল ইকদুল ফারীদ : ১ম খণ্ড ১১৭পৃষ্ঠা]

লক্ষ্য করুন, কীভাবে উমার ﷺ আয়াতের শব্দগুলোই ব্যবহার করেছেন। তিনি আয়াতের মতলব এটাই বুঝেছেন যে, বখতনসর মুমিন ছিল না; কিন্তু তাকেই আল্লাহ ﷻ বনী ইসরাইলকে ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

এটা ছিল ইহুদীদের প্রথম উত্থান, দেখা যাক, তাদের দ্বিতীয় উত্থান কী?

সম্ভত বর্তমান ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে যা ঘটছে, সেটাই তাদের দ্বিতীয় উত্থান। বর্তমান উত্থানে তারা ফিলিস্তিনের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের হাত প্রসারিত হয়েছে বহু দূর পর্যন্ত। মিসর, লেবানন ও জর্ডানের বহু জায়গা তারা জবরদখল করেছে। দখল করেছে সিরিয়ার কিছু অংশ। এখনও তাদের আগ্রাসন অব্যাহত রয়েছে। বৃহত্তর ইসরাইল প্রতিষ্ঠার নীল নকশায় তারা আজও আধিপত্য বিস্তার করে যাচ্ছে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের সাথে তাদের রয়েছে অর্থনৈতিক যোগাযোগ। রয়েছে রাজনৈতিক প্রভাব। তাদের রয়েছে নির্দিষ্ট সামাজিক রূপরেখা। রয়েছে উদ্দেশ্য সাধনের নানা নীল নকশা। আমরা সবাই জানি, আশপাশে অনেকগুলো মুসলিম দেশ থাকা সত্ত্বেও প্রিয় ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে শিকড় গেড়ে বসেছে এই ক্ষুদ্র বিষফোড়া। এগুলো সবই উত্থান। আল্লাহ ﷻ-এর কিতাবে আগত সুসংবাদের ভিত্তিতে আমরা আশা রাখি, অসত্বর তিনি এসব ইহুদীদের উপর আবার তাঁর বান্দাদের চাপিয়ে দিবেন। আবার তাদের বিপর্যয় ঘটবে। সীমাহীন ফেতনা-ফাসাদ, জুলুম-অত্যাচার ও কুকর্মের দরুন আগে তারা যেমন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, আবার তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

এখানে আমি তাওরাত ও তালমুদে বর্ণিত বখতনসরের হাতে বনী ইসরাইলের বিপর্যয়ের কারণ সংশ্লিষ্ট স্বয়ং ইহুদীদের ব্যাখ্যা তুলে ধরছি। যাতে আমরা বুঝতে পারি যে, বিষয়টি তাদের ভালোভাবেই জানা আছে। তবে তারা স্বেচ্ছায়ই ভ্রান্তির পথ বেছে নিয়েছিল।

ইহুদীদের কাছে তাওরাতের একটি পবিত্র ব্যাখ্যাগ্রন্থ হল 'তালমুদ'। সেখানে রয়েছে– *এটা* (বখতনসর কর্তৃক ইয়াহুযা সাম্রাজ্যের ধ্বংস) *তখন সংঘটিত হয়, যখন বনী ইসরাইল তাদের পাপাচারের শেষ সীমানায় উপনীত হয়। মহান প্রভুর সহ্যসীমাকেও তারা অতিক্রম করে। যখন তারা জেরিমিয়ার নির্দেশ ও সতর্কবাণী শুনতে অস্বীকৃতি জানায়।*

জেরিমিয়া তাওরাত বর্ণিত ইহুদীদের একজন নবী। তাওরাতের ভাষ্যমতে জেরিমিয়া বখতনসরকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন– *তুমি ধারণা করো না যে, শুধু নিজের শক্তিবলে তুমি আল্লাহর নির্বাচিত জনগোষ্ঠীর উপর বিজয়ী হতে পেরেছ। এটা তাদের পাপাচার ও কুকর্মের ফল, যা তাদের উপর এই শাস্তি টেনে এনেছে।*

ইহুদীদের পবিত্র তালমুদে একথা বর্ণিত আছে। এমনিভাবে ইশইয়া-এর বাণীও তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে। তিনিও বনী ইসরাইলের একজন নবী। তাওরাতের ইশইয়া অংশে তিনি বলেন– *বিভ্রান্ত জাতির প্রতি দুর্ভোগ! পাপের সাগরে নিমজ্জিত জনগোষ্ঠী। কুকর্মকারীদের বংশধর। ফাসাদ সৃষ্টিকারী সন্তান। যারা রবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইসরাইলের পবিত্রতার অবমাননা করেছে। পশ্চাদপদ হয়েছে। ...*

এসব কথা তাওরাতে রয়েছে। আরও বর্ণিত আছে–

দুনিয়া তার বাসিন্দাদের নীচে কলুষিত হয়ে উঠেছে। কেননা, তারা শরীয়তের সীমা লংঘন করেছে। ফরজ বিধান পরিবর্তন করেছে। চিরন্তন অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।

একথা রয়েছে তাদের নিজেদের গ্রন্থে। তা হলে চিন্তা করুন যে, বাস্তবতা কেমন ছিল। যখন তারা তাদের বিকৃত কিতাবগুলোতে নিজেরাই এসব কথা বলেছে, তখন বাস্তবরূপ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

তারা পৌত্তলিকতা ও গুমরাহীতে লিপ্ত হয়েছিল। দীন থেকে এত দূরে সটকে গিয়েছিল যে, কোনো বিবেক তা ধারণা করতে পারবে না এবং তার বিবরণ দিতে পারবে না কোনো কলম। মুসা ﷺ থেকে শুরু করে অন্যান্য নবীর কাহিনীতে তাদের স্বভাব সম্পর্কে আমাদের রব যে বিবরণ দিয়েছেন সেটাই যথেষ্ট।

বখতনসরের অভিযান ও ইয়াহুযা সাম্রাজ্যের পতনের পর ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে নতুন যুগের সূচনা হয়। শুরু হয় ব্যাবিলন শাসন। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯ সাল পর্যন্ত মাত্র ৪৭ বছর তা স্থায়ী হয়। কেমন যেন তারা শুধু বনী ইসরাইল আর জালেম ইয়াহুযা সাম্রাজ্যের পতন ঘটাতেই এসেছিল। যারা ছিল আল্লাহ ﷻ-এর শরীয়ত থেকে অনেক দূরে। ব্যাবিলন শাসনের পর শুরু হয় পারসিক শাসন। যারা ইরানের ভূখণ্ড থেকে এসেছিল। ইরাক ও ইরানের ভূখণ্ডের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে আধুনিক যুগে আজও যা বিদ্যমান। ইসালামী সাম্রাজ্য সূচিত হওয়ার আগে এবং পরেও।

পারসিক ও ব্যাবিলনদের মধ্যে যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করে। ইহুদীরা সাইরাস দ্যা গ্রেটের নেতৃত্বাধীন পারসিকদের সহায়তা করলে যুদ্ধে পারস্য বিজয় লাভ করে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ইহুদীরা বন্দী হয়ে ব্যাবিলন এসে দাসত্বের জীবন যাপন করছিল। কাজেই তারা ব্যাবিলনদের বিরুদ্ধে পারসিকদের সাহায্য করে। এ বিজয়ের পর ফিলিস্তিন পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। এ শাসনামল ২০৭ বছর স্থায়ী হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২ সালে প্রসিদ্ধ রোমান সেনাপতি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট পারস্যকে পরাজিত করে। প্রতিষ্ঠা করে গ্রিক শাসন। তারাও ছিল পৌত্তলিক।

ইহুদীরা বিজয়ী সেনাপতি আলেকজান্ডারের অধীনে বসবাস করতে থাকে। ফিলিস্তিন বিজয়ের এ যাত্রায় আলেকজান্ডার মিসর ও ইরাকসহ এশিয়ার বহু অঞ্চল জয় করে। এতে তার সাম্রাজ্য ব্যাপক সম্প্রসারিত হয়।

এখানে আমি প্রসিদ্ধ একটি ভুলের দিকে ইঙ্গিত করতে চাই। অনেকেই আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেটকে 'যুলকারনাইন' বলতে চান। তার কাহিনীকে কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইনের কাহিনীর সাথে মিলিয়ে ফেলেন। আমরা এখানে বলি, কুরআনে বর্ণিত জুলকারনাইন ছিলেন আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী। একজন নেককার বান্দা। কিন্তু ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজাণ্ডার ছিল একজন পৌত্তলিক। সে ওইসব দেব-দেবীরই পূজা করত, যেগুলোর পূজা করত গ্রিকরা। তাই উভয়কে মিলিয়ে ফেলার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

আলেকজাণ্ডার ও তার পরবর্তী প্রজন্ম দীর্ঘ ২৬৯ বছর পর্যন্ত ফিলিস্তিন শাসন করে। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ সাল পর্যন্ত। গ্রিকরা ছিল উন্নত সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী। যা দেখে ফিলিস্তিনের ইহুদীরা হতভম্ভ হয়ে যায়। তারা গ্রিকদের ভাষা ও জীবনধারা অধ্যয়ন করতে শুরু করে। ফিলিস্তিনে বসবাসকারী স্বল্পসংখ্যক ইহুদী তখন দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। একদল গ্রিকদের অনুসরণ করে তাদের মধ্যে মিশে যায়। গ্রিকদের স্বভাব-চরিত্র ও জীবনধারা গ্রহণ করে। গ্রিক দেব-দেবীর উপাসনাও শুরু করে দেয়। এসব ইহুদীরা বিকৃত মূল তাওরাতের মধ্যে আরও পরিবর্তন-পরিবর্ধনে লিপ্ত হয়।

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, রব সম্পর্কে তারা কীভাবে মন্তব্য করে। এই শ্রেণির ইহুদীদের মতে রব পবিত্র কোনো সত্তা নন। তাদের মতে রব কখনও মানুষের কাছে পরাজিত হন। এমন কি অনেক কিছু তিনি ভুলেও যান। কখনও তাঁর চরিত্র হয় অসম। এরূপ আরও অসংখ্য ভ্রান্তি রয়েছে, যেগুলো গ্রীক চেতনা থেকে বের হয়ে ইহুদী ধর্মকে আচ্ছন্ন করেছে।

ক্ষুদ্র আরেকটি দল আগের বিকৃত ইহুদী ধর্মের উপর অটল থাকে। অন্য দলটির মত তারা গ্রিকদের মধ্যে নিজেদের বিলীন করেনি। তারা তাদের মধ্যে আত্ম-প্রকাশকারী 'জুডাস ম্যাকাবি'-এর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়। ইহুদী সম্প্রদায়ের কাছে সে ছিল একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তার নেতৃত্বে এ দলটি কয়েকটি বিপ্লবও ঘটায়।

গ্রিকরা এ বিপ্লবকে মূল্যায়ন করে। তারা জুডাস ম্যাকাবিকে আল-কুদস শহরে প্রবেশের অনুমতি দেয়। এই প্রবেশ ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১১৬ সালের ২৫ জানুয়ারি। এ দিনটি ইহুদীদের একটি প্রসিদ্ধ আনন্দের দিন। এর নাম আলোর উৎসব বা 'হানুকা'। কেননা, এক ইহুদী বিকৃত তাওরাতকে সংরক্ষণ করেছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ সাল পর্যন্ত এমনই ছিল ফিলিস্তিনের অবস্থা। এরপর নতুন শাসনের উত্থানে পরিস্থিতি একেবারে বদলে যায়। সেই আধিপত্য চলতে থাকে ধারাবাহিক ৭০০ বছর।

আসুন, দেখে নিই কী ছিল সেই নতুন শাসন?

ওই সময়কালে কী কী ঘটনা ঘটে?

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ঈসা ﷺ-এর ইতিহাস কী?

মসীহের জন্ম ও ইহুদী অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি

ঈসা ﷺ-এর জন্মের ৩২৪ বছর পর এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হয়, যা তৎকালীন দুনিয়ার পুরো প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করে দেয়। তা হল রোমান সম্রাট কনস্টানটাইনের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ। তার মা আগেই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। কনস্টানটাইন রোমান সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ। কনস্টান্টিনোপল শহরের স্থপতি সে। যা পরবর্তীতে প্রসিদ্ধ বাইযান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। যেটা বর্তমান তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহর। সম্রাট কনস্টানটাইন রোম শহরে অবস্থান করে বিস্তীর্ণ রোমান সাম্রাজ্য পরিচালনা করত। ভূমধ্য সাগররের পার্শ্ববর্তী সবগুলো দেশ ছিল এ সাম্রাজ্যের অধীনে। রোম সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি উপসাগরের নামে এই সাগরের নামকরণ করা হত। এজন্য পুরানো কাগজ-পত্রে এ সাগরকে রোম সাগরও বলা হয়েছে। ইতালি, ফ্রান্স ও জার্মানীসহ পূর্ব ইউরোপ পুরোটা ছিল রোম সাম্রাজ্যের অধীন। সেই সাথে জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিনসহ শামের পুরো উপকূল। মিসর, লিবিয়া, তিউনিশিয়া, মরক্কো ও আলজেরিয়াসহ আরও অনেক ভূখণ্ড। তার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর খ্রিস্টধর্মই হয়ে ওঠে এসব ভূখণ্ডের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। ফলে বিশ্বজুড়ে খ্রিস্টধর্ম দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পৌত্তলিকতা থেকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের হিরিক পড়ে যায় সর্বত্র। কিন্তু এসব অঞ্চলের পৌত্তলিক চেতনার প্রভাব তখনও অবশিষ্ট থেকে যায়। ধীরে ধীরে তা নতুন খ্রিস্টান ধর্মে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। ওইসব অঞ্চলে যেসব কু-সংস্কার বিদ্যমান ছিল– একাধিক ঈশ্বরের ধারণা, ঈশ্বরের আকৃতি, ঈশ্বরের বিবাহ করা ও সন্তান জন্ম দেওয়াসহ দীর্ঘকাল যেসব

পৌত্তলিক মতাদর্শে জীবনাতিপাত চলে আসছিল, তার সবই নতুন ধর্মে অনুপ্রবেশ করে। ফলে খ্রিস্টধর্ম তার এ বিকৃত রূপ নিয়েই রোমান সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

খ্রিস্টধর্ম বিস্তার লাভ করা এসব অঞ্চলের মধ্যে ফিলিস্তিন ছিল অন্যতম। কারণ, এ ভূখণ্ডও তখন রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রায় তিন শতাধিক বছর এখানে খ্রিস্টধর্ম অবশিষ্ট থাকে। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আবির্ভাব পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে, ঈসা ﷺ-এর জন্মের পরবর্তী দীর্ঘ ৩০০ বছরে ফিলিস্তিনের যৎসামান্য লোকই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল।

ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে খ্রিস্টধর্মের বিস্তার প্রসিদ্ধ সম্রাট কনস্টানটাইনের কৃতিত্ব। তার মা একবার ফিলিস্তিন পরিদর্শনে গিয়েছিল। সেখানে সে অনেক গির্জা নির্মাণ করে। কেননা, সে তখন নতুন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। এ নতুন ধর্মের সেবায় ব্রতী ছিল সে। আল-কুদস শহরে সে নির্মাণ করেছিল আজকের প্রসিদ্ধ 'পুনরুত্থান গির্জা'। এ গির্জা নির্মাণের পিছনে যে কাহিনী তারা দাবি করে, তা হল ঈসা ﷺ-কে হত্যা করা হলে তিনি তিনদিন মৃত ছিলেন। এরপর ফিলিস্তিনের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। ঈসা ﷺ-এর আত্মপ্রকাশের এই জায়গায় তারা 'পুনরুত্থান গির্জা' নির্মাণ করে। পুনরুত্থান মানে ঈসার নিহত হওয়ার তিনদিন পর পুনরায় আত্মপ্রকাশ। এই কাহিনী নিতান্ত বানোয়াট। বিশুদ্ধতার লেশমাত্রও এতে নেই। আমরা জানতে চাই, প্রভু যেই তিনদিন অদৃশ্য ছিলেন, সেই তিনদিন দুনিয়ার অবস্থা কী হয়েছিল?

রোমান বাইযান্টাইন বিশ্বাসে দেখতে পাবেন, তারা বলে, ঈশ্বর যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, তখন দুনিয়াতে ভূমিকম্প হয়। তা হলে আপনিই অনুমান করুন, ঈশ্বর গায়েব হচ্ছেন এবং তিনদিনের জন্য মারা যাচ্ছেন...!!

এটা এমন এক ফালতু বক্তব্য, যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কেউই পেশ করেনি। বড় আফসোসের কথা, খ্রিস্টানরা বলে থাকে, সম্রাট কনস্টানটাইনের মা হেলেনা এই জায়গাতেই পুনরুত্থান গির্জা নির্মাণ

করেছে। এমনইভাবে বেথেলহেমে সে নেটিভিটি গির্জা নির্মান করে এবং নাজারেথে নির্মাণ করে এ্যানাসিয়েশন গির্জা। যেখানে ঈসা ﷺ বেড়ে উঠেছিলেন।

এভাবে পুরো ফিলিস্তিনে খ্রিস্টবাদ ছড়িয়ে পড়ে। তবে রোমানরা মসজিদে আকসার কাছে যায়নি। মসজিদে আকসা এমন একটি স্থান, যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী আল্লাহর উপাসনা হয়ে আসছে। যেখানে ঈসা ﷺ তাঁর রবের এবাদত করেছেন। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে প্রবেশকারী বনী ইসরাইলের প্রথম নবী ইউশা ﷺ যেখানে আল্লাহর এবাদত করেছেন। এমনইভাবে দাউদ ও সুলাইমান ﷺ-সহ বনী ইসরাইলের সমস্ত নবী যেখানে আল্লাহর এবাদত করেছেন। হয়তো এজন্যই বাইযান্টাইনরা তার কাছে ঘেঁষেনি। আমরা আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করি যে, খ্রিস্টানদের বর্ণনাগুলো একথা স্বীকার করে যে, তারা মসজিদে আকসার কাছে যায়নি। এবং সেটা গির্জায় পরিণত করেনি। অন্যথায় পরবর্তীতে মুসলমানদের জন্য এটাকে মসজিদে রূপান্তর করা মুশকিল হয়ে যেত। এ ছিল রব্বুল আলামীনের কুদরত।

ফিলিস্তিনে খ্রিস্টীয় সময়কাল ৩১২ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ইসলামী বিজয়ের আগ পর্যন্ত। এখানে একটি ছোট্ট বিরতি নিয়ে খ্রিস্টবাদের একটি কাহিনী বর্ণনা করি। খ্রিস্টীয় ৩২৪ সালে সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর পঞ্চাশেরও অধিক সংখ্যক ইঞ্জিল দেখতে পায় সে। আয়াত সম্বলিত অগনিত পত্রও পায়। যেগুলো সম্পর্কে বলা হত যে, এগুলো ঈসা ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ ওহী কিংবা তাঁর বাণী। কাজেই সম্রাট কনস্টানটাইন একটি সম্মেলনের নির্দেশ দেয়। যেখানে সমগ্র দুনিয়া থেকে খ্রিস্টানরা সমবেত হবে। তারা ওইসব ইঞ্জিল পেশ করবে, যার নিয়মে প্রভুর উপাসনা করা হয়। অনুষ্ঠিত হয় 'নিকিয়া সম্মেলন'। বর্তমান তুরস্কে সেই নিকিয়া শহর আজও বিদ্যমান। সে সম্মেলনে প্রচুর সংখ্যক উচ্চপদস্থ খ্রিস্টান পাদ্রী, যাযক ও বীশপ একত্র হয়। কোনো কোনো বর্ণনায় তাদের সংখ্যা ছিল ৩০০ জন। কোনো কোনো বর্ণনায় ৪০০ জন। কোনো কোনো বর্ণনায় ৫০০ জন। তারা আলোচনা করে যে, সেই ইঞ্জিল কোনটি, যার অনুসরণ করা আবশ্যক।

CamScanner

প্রত্যেকে নিজের সাথে থাকা ইঞ্জিল বের করে। সব মিলিয়ে পঞ্চাশেরও অধিক ইঞ্জিল ও অসংখ্য পত্র পাওয়া যায়। এসব ইঞ্জিলের মধ্য থেকে তারা চারটি ইঞ্জিলের ব্যাপারে একমত হয়। সেগুলো হল মথি (Matthew), মার্ক (Mark), লুক (Luke) ও যোহন (John)। এছাড়াও আরও অনেক প্রসিদ্ধ ইঞ্জিল রয়েছে, যেগুলো নিকিয়া সম্মেলনে গৃহীত হয়নি।

অতঃপর তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, আগামীতে এই চারটি ইঞ্জিলেরই শুধু অনুসরণ করা হবে। স্বভাবত এসব ইঞ্জিলের পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে অনেক দ্বন্দ্ব। এমনকি একই ইঞ্জিলের বাণীসমূহের মধ্যেও রয়েছে স্পষ্ট দ্বন্দ্ব। কেননা, এগুলো মানুষের হাতে রচিত এবং ঈসা ﷺ-এর অদৃশ্য হওয়ার কয়েক শত বছর পর সংকলিত। আগে আমরা তাওরাত সম্পর্কে বলেছি যে, যেই মুসা ﷺ-এর উপর তা নাযিল হয়েছিল, তাঁর ইন্তেকালের ৭০০ বছর পর সেটা সংকলিত হয়। সেটা তারা ৪০০ বছর সময় লাগিয়ে লেখে। এবার চিন্তা করুন যে, কী পরিমাণ বিকৃতির সম্মুখীন হয়েছে ওল্ড টেস্টামেন্ট (তাওরাত) এবং কী পরিমাণ বিকৃতির সম্মুখীন হয়েছে নিউ টেস্টামেন্ট (ইঞ্জিল)?

দীর্ঘকাল ফিলিস্তিনে এই অবস্থা বিরাজমান থাকে। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের জেনে রাখা উচিত। তা হল ৩৯৫ সালে রোমান সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় কনস্টান্টিনোপল। আর পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় রোম। রসুল ﷺ-এর জন্মের প্রায় ১০০ বছর আগে ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য একেবারে বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। এবং যাবতীয় বিষয়াদি পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত হয়, যার রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল। ফিলিস্তিনসহ সিরীয় ভূখণ্ডগুলো সব এ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। যা হোক, ৪৭৬ সাল থেকে ফিলিস্তিনে শুরু হয় পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের শাসন। যা নবী ﷺ-এর নবুওয়তপ্রাপ্তি পর্যন্ত প্রায় ১৬০ বছর স্থায়ী হয়।

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকলেও তা ছিল রোম ও পারস্যের দ্বন্দ্বের জায়গা। এ রেষারেষির জের ধরে ৬১৪ সালে

নববী যুগে সংঘটিত হয় সেই প্রসিদ্ধ যুদ্ধ। যাতে পারস্য বিজয় লাভ করে। পারসিকরা রোমানদের থেকে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড ছিনিয়ে নেয়। এর বিবরণ নিয়ে আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন–

> আলিফ লাম মীম। রোমানরা পরাজিত হয়েছে। [সুরা রুম : ১, ২]

রোমানদের এ পরাজয় মক্কার মুসলিম ও মুশরিকদের মধ্যে অনেক প্রভাব ফেলে। এর সাত বা নয় বছর পর রোমানরা আবার পারসিকদের পরাজিত করে। তারা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে আধিপত্য ফিরিয়ে আনে। যেমন, আমাদের রব ﷻ উল্লেখ করেছেন–

> (রোমানরা পরাজিত হয়েছে) নিকটবর্তী অঞ্চলে। পরাজয়ের পর সত্বর তারা বিজয়ী হবে। [সুরা রোম : ৩]

৫৭০ খ্রিস্টাব্দে রসুল ﷺ জন্মগ্রহণ করেন। তখন ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড ছিল রোমানদের অধীনে। আনুমানিক ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি নবুওয়ত লাভ করেন। একত্ববাদের বাণী প্রচারে আদিষ্ট হন। তাঁর আবির্ভাব ছিল পুরো দুনিয়ার জন্য একটি বিস্ময়। ফিলিস্তিনবাসীদের জন্যও। ইহুদী-খ্রিস্টানসহ সব মানুষের জন্য এ ছিল বিস্ময়। তবে স্বল্প সংখ্যক ইহুদী আলেম ও খ্রিস্টান পাদ্রী ছিল ব্যতিক্রম। তারাই শুধু বিশ্বাস করতেন যে আমাদের রব এক। সমস্ত এবাদত তাঁকেই উৎসর্গ করা বাঞ্ছনীয়। তারা স্বীকার করতেন যে, এ যুগে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তারা জানতেন, একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন সম্পর্কে তারা অবগত ছিলেন। তারা ছিলেন খুব স্বল্প সংখ্যক। তৎকালীন দুনিয়ার দূরাবস্থা ছিল খুব উদ্বেগজনক। রসুল ﷺ খুব সংক্ষেপে সে অবস্থা চিত্রায়িত করেছেন। তাঁকে সমৃদ্ধ কথা বলার দক্ষতা প্রদান করা হয়েছিল। তিনি বলেন–

> আল্লাহ ﷻ দুনিয়াবাসীর প্রতি দৃষ্টি দেন। আরব-অনারব সকলের প্রতি রুষ্ট হন। তবে স্বল্প সংখ্যক আহলে কিতাব বাদে। [মুসলিম : ৭৩৮৬]

তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন নিতান্তই কম। হাদীসে বর্ণিত 'বাকায়া' আরবী শব্দটি নগণ্যতার দিকে ইঙ্গিত করে। তখন কোনো দল বা জনগোষ্ঠী

ছিল না; বরং সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল কিছু ব্যক্তি, যারা আল্লাহ ﷻ-এর এবাদত করতেন।

দুনিয়ার অবশিষ্ট মানুষ পৌঁছে গিয়েছিল পৌত্তলিকতা ও কুফরের চূড়ান্ত সীমায়। সত্য থেকে তারা এতটাই দূরে সরে গিয়েছিল যে, আল্লাহ ﷻ তাদের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এ ছিল পুরো দুনিয়ার অবস্থা। আমরা দেখতে পাই সালমান ﷺ সে যুগে সত্যের সন্ধানে কী পরিমাণ ছুটে বেড়িয়েছেন। সত্যের সন্ধানে তিনি পারস্য থেকে বেরিয়ে বহু শহর ঘুরেছেন। এক শহর থেকে আরেক শহরে যেতেন। সেখানে মাত্র একজন লোককে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত পেতেন। শামে একজন, অ্যামোরিয়ামে একজন, নিসিবিসে একজন। এক পর্যায়ে তিনি সংবাদ পান যে, এ যুগে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তিনি তাঁকে পাওয়ার জন্য ছুটতে থাকেন। এক পর্যায়ে মদীনা মুনাওয়ারায় এসে পৌঁছেন। এ ঘটনা সাক্ষ্য বহন করে যে, তৎকালীন দুনিয়ায় আল্লাহর প্রকৃত এবাদাতকারীর সংখ্যা ছিল খুব কম। এতটাই কম যে, আমরা চাইলে তাদের নাম ও জায়গা উল্লেখ করে গণনা করে দিতে পারি।

তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে নবী ﷺ প্রেরিত হন। যেমন, পূর্ববর্তী নবীরা একই দাওয়াত নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। আদম ﷺ থেকে নিয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সমস্ত নবীর কার্যক্রম ছিল এক ও অভিন্ন।

মক্কা মুকাররামায় তিনি অনেক নিগ্রহের সম্মুখীন হন। ধারাবাহিক ১৩ বছর তিনি মক্কায় এক দূর্বিসহ জীবন অতিবাহিত করেন। এক পর্যায়ে হিজরতের নির্দেশ আসে। এখানে আমাদের রসুল ﷺ-এর জীবন চরিত্র বা ফিলিস্তিনের বাইরের অন্য কোনো ঘটনা উল্লেখ করা উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু সেই আলোচনাটুকুই করব যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফিলিস্তিনের কাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট। যদিও তা ঘটে থাকে এ বরকতময় ভূখণ্ডের বাইরে।

ফিলিস্তিনের সাথে রসুল ﷺ-এর সম্পর্ক

নবুওয়াতপ্রাপ্তির সূচনাকাল থেকেই রসুল ﷺ-এর ছিল ফিলিস্তিনের সাথে দৃঢ় বন্ধন। মুসলমানরা বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে সালাত আদায় করতেন। ইসলামী দাওয়াতের প্রথম দিন থেকেই মসজিদে আকসা মুসলমানদের কিবলা। সত্যিই বিষয়টি বিস্ময়কর। সালাত হচ্ছে মুসলমানদের উপর ফরজকৃত অন্যতম প্রথম এবাদত। মক্কায় প্রকাশ্যে ইসলামী দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করার আগ থেকে সালাতের আমল শুরু হয়। কিছু কিছু বর্ণনায় এসেছে– মুশরিকরা অবাক হয়ে মুসলমানদের সালাত আদায় দেখত। সেই সালাত মুশরিকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। তারা বলাবলি করত, এর কাছে নাকি আসমান থেকে স্বপ্ন বা ওহী আসে।

রসুল ﷺ তখনও রিসালাতের প্রকাশ্য ঘোষণা দেননি। মুসলমানরা তখন মক্কায়। কাবার মাটিতে। অথচ তারা সালাত আদায় করেন ফিলিস্তিনের মসজিদে আকসা অভিমুখে। কয়েকটি কারণে এ ছিল খুব বিস্ময়কর।

প্রথমত : কাবার মর্যাদা বেশি। কাবা তাদের পাশেই অবস্থিত। তবুও কেন আল্লাহ ﷻ তাদেরকে মসজিদে আকসামুখী হতে নির্দেশ দেন। অথচ আমরা সবাই জানি কাবার মর্যাদার তুলনায় আকসার মর্যাদা কম। তবুও আল্লাহ ﷻ আকসা পানে অভিমুখী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিষয়টি খুবই বিস্ময়কর।

দ্বিতীয়ত : তৎকালীন লোকজন মসজিদে আকসা চিনত না। মক্কা মুকাররামা ও আরব উপদ্বীপের মানুষ যখন এই নতুন ধর্ম ও তার

শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে জানতে চাইত, তখন জওয়াব ছিল, আমরা সালাত আদায় করি এবং তাতে মসজিদে আকসার প্রতি অভিমুখী হই।

মসজিদে আকসা কেন? এ প্রশ্ন অনেকের মনেই দেখা দিতে পারে। অথচ যদি বলা হত, বাইতুল্লাহ অভিমুখে তা হলে কেউ আর প্রশ্ন তুলবে না। কেননা, তৎকালীন মক্কা ও পুরো আরব উপদ্বীপে কাবা ছিল সুপরিচিত। কিন্তু যখন বলব, মসজিদে আকসা। তখন প্রশ্ন উঠবে এবং বিস্ময়ের সৃষ্টি হবে।

তাছাড়া মসজিদে আকসা ছিল বিরান। মেরাজের রাতে রসুল ﷺ-কে যখন মসজিদে আকসায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সেখানে তিনি শুধু নির্ধারিত ভবন দেখেছিলেন। যার পূর্ণ বিবরণও তার আয়ত্বে ছিল। কিন্তু তা ছিল বিরান ও পরিত্যাক্ত। যুগ যুগ থেকে তা ছিল অনাবাদ। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে যখন খ্রিস্টধর্মের বিস্তার ঘটে, তখন তারা মসজিদে আকসার কোনো যত্ন নেয়নি। তবে আশপাশের আল-কুদস ও অন্যান্য শহরে অবস্থিত গির্জাগুলোর পরিচর্যা করেছিল।

আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে আমাদের রব ﷻ জানতেন যে, মুসলমানদের সর্বশেষ কিবলা হবে মক্কায় অবস্থিত কাবা। তা হলে এই ব্যতিক্রম একটি ধাপের কী প্রয়োজন ছিল? কেন মুসলমানরা নির্দিষ্ট একটা সময় ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড বা মসজিদে আকসা অভিমুখে সালাত আদায় করেন? এরপর তারা চিরন্তন কিবলার দিকে ফেরেন, যা রসুলের অবশিষ্ট জীবন এবং কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার অবশিষ্ট জীবনে বলবৎ থাকবে। আজ সমস্ত মুসলমানের একমাত্র কিবলা কাবা। তা হলে কেন কিছুদিনের জন্য মসজিদে আকসাকে কেবলা করা হয়েছিল? আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে মসজিদে আকসামুখী করা অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ইঙ্গিত করে। আমি আপনাদের সামনে শুধু অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় তুলে ধরছি।

প্রথম বিষয় : সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াত হচ্ছে পূর্ববর্তী সব নবীর দাওয়াতের পরিপূরক ও পরিসমাপ্তি। এ ছিল আল্লাহর এবাদত ও একত্ববাদের দাওয়াত। রসুল ﷺ-এর আগে অসংখ্য নবী-রসুলের ওহীর অবতরণস্থল ছিল ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড। আল্লাহ ﷻ

মুসলমানদেরকে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডমুখী করার মাধ্যমে পুরো বিশ্বকে একই চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দুতে সমবেত করেছেন। অর্থাৎ সমস্ত নবী একই ইলাহ অভিমুখী। একই রবের উপাসক। যদিও যুগের চাহিদার কারণে শরীয়ত ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। তবে সমস্ত শরীয়ত একই ইলাহের এবাদতের পথ নির্দেশ করে। তিনি হলেন রব্বুল আলামীন ﷻ। দাউদ, সুলাইমান, মুসা, ইউশা ও ঈসা ﷺ-এর রব। এই বরকতময় ভূখণ্ডে বসবাসকারী সমস্ত নবী ও জনসাধারণের রব। কত শত নবীই না বসবাস করেছেন এ ভূখণ্ডে। এ হল প্রথম মর্ম। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে রয়েছে সমস্ত নবীর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রকাশ। আমরা বলি না যে, আমাদের দীন পূর্ববর্তী অন্যান্য ধর্মকে ছোট করেছে। যদ্দরুন পূর্ববর্তী নবীদের মর্যাদাহানী হবে। আমরা তাদের মর্যাদা সম্মানকে সমুন্নত করতে সচেষ্ট। পূর্ববর্তী নবীদের উপর ঈমান আনয়ন আমাদের ঈমানের অন্যতম একটি রুকন বা ভিত্তি হিসাবে গণ্য।

দ্বিতীয় মর্ম : মসজিদে আকসাকে মুসলিম উম্মাহর প্রথম কিবলা নির্ধারণের অন্যতম একটি রহস্য হচ্ছে সমস্ত মুসলমানের দৃষ্টিতে আল-কুদস, মসজিদে আকসা ও ফিলিস্তিনের মর্যাদা বৃদ্ধি করা। এ জন্যই মুসলমানকে ধারাবাহিক ১৫ বছর মসজিদে আকসা অভিমুখে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। অর্থাৎ নবুওয়ত প্রাপ্তির প্রথম দিন থেকে মক্কা জীবনের ধারাবাহিক ১৩ বছর মুসলমানরা মসজিদে আকসা অভিমুখে সালাত আদায় করেন। একপর্যায়ে রসুল ﷺ-এর কাবার দিকে অভিমুখী হওয়ার মনোবাসনা জাগ্রত হয়। নিঃসন্দেহে কাবার মর্যাদাই অধিক। এজন্য তিনি কাবা অভিমুখে সালাত আদায়ের মনোবাসনা পোষণ করতেন। এজন্য তিনি সালাত আদায়ের সময় তাঁর ও মসজিদে আকসার মাঝে কাবাঘর রেখে দাঁড়াতেন।

মদীনায় হিজরতের পরও ১৭ মাস মসজিদে আকসা মুসলমানদের কিবলা ছিল। অবশেষে দ্বিতীয় হিজরীর ১৫ শাবান কিবলার পরিবর্তন ঘটে।

যখন রসুল ﷺ মদীনা মুনাওয়ারায় আসেন, তখন মক্কার অবস্থান হয়ে যায় দক্ষিণে এবং আল-কুদস উত্তরে। ধারাবাহিক ১৭ মাস তিনি মসজিদে আকসামুখী হয়ে এবং কাবা পিছনে রেখে সালাত আদায়

করেন। এ সবই ছিল মুসলমানদের অন্তরে মসজিদে আকসার মর্যাদা বদ্ধমূল করার প্রয়াস। কিবলা পবির্তন হওয়ার পরও মসজিদের আকসার প্রতি রসুল ﷺ-এর গুরুত্বের কোনো ঘাটতি ছিল না। বরং মসজিদে আকসার সাথে তার হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল চির অটুট। প্রসিদ্ধ হাদীসে বিষয়টি ফুটে উঠেছে–

> তিনটি মসজিদ বাদে আর কোনো মসজিদ অভিমুখে ভ্রমণ করা যাবে না– আমার এ মসজিদ (মসজিদে নববী), মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসা। [বুখারী : ১৯৯৫]

একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে তিনি গড়ে তুলেছেন তিনটি বড় মসজিদের মধ্যে অটুট বন্ধন।

প্রিয় মুসলিম ভাই! যদি কাবা বা মসজিদে নববীর কোনো একটি আক্রান্ত হয়, তা হলে আপনার অনুভূতি কী হবে? আজ মসজিদে আকসা দখল হওয়ায় আপনার সেই অনুভূতিই কাম্য। রসুলুল্লাহ ﷺ পূর্বোক্ত হাদীসে তিনটি মহান মসজিদকে একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন।

অপর এক হাদীসে তিনি বলেন–

> মসজিদে হারামে সালাত আদায় করলে অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক লক্ষ গুণ বেশি সাওয়াব হয়। আমার মসজিদে এক হাজার গুণ। আর মসজিদে আকসায় পাঁচশত গুণ। [মুসনাদু বাযযার : ৪১৪২]

এ হচ্ছে এমন মসজিদ, যার রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য শুধু আকসা মসজিদেরই নয়। বরং পুরো ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের। ফিলিস্তিনকে ঘিরে রাখা শাম ও জর্ডানের সকল ভূখণ্ডের। এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

নববী যুগে ফিলিস্তিন

ধারাবাহিক ১৫ বছর মুসলমানরা মসজিদে আকসা অভিমুখে সালাত আদায় করেন। মক্কা নগরে ১৩ বছর। হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারায় ১৭ মাস। যা রসুল ﷺ-এর নবুওয়তী জীবনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সময়। অর্থাৎ এ ১৫ বছর ছিল মূল নবুওয়তের ২৩ বছরের অন্তর্ভুক্ত। নবীজী ﷺ-এর জীবনের বড় একটি অংশ কেটেছে মসজিদে আকসা অভিমুখে সালাত আদায় করে। এতে রয়েছে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মুসলমানদের হৃদয়ে আকসার মর্যাদা সমুন্নত করা। আর একথা শুধু সেই প্রজন্মের সাথেই নির্দিষ্ট নয়, যারা মসজিদে আকসা অভিমুখে সালাত আদায় করেছিলেন। বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মুসলমানের জন্য। আমরা সবসময় বলতে থাকব, মসজিদে আকসা আমাদের প্রথম কিবলা; আমরা কখনও তাকে ভুলব না। এটা আমাদের দীনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তী জীবনের অব্যাহত ১৫টি বছর। রসুল ﷺ শুধু মসজিদে আকসাকেই সম্মান করতেন না; বরং তিনি এর আশপাশের ভূখণ্ডকেও সম্মান করতেন। আমাদের রব যেমন বলেছেন—

> পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি নিজের বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত— যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল। [সুরা বনী-ইসরাঈল : ১]

মায়মুনা বিনতু সাদ ؓ রসুল ﷺ-এর কাছে এ বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমাদেরকে বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে বলুন? রসুল ﷺ বললেন—

> তা হাশর-নাশরের ভূখণ্ড। তোমরা সেখানে গমন করো। সেখানে সালাত আদায় করো। [ইবনু মাজাহ : ১৪০৭]

এই হাদীসে আল-কুদস ও তার আশপাশের শামের ভূখণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। চিন্তা করুন, এ ভূখণ্ডের বরকত ও মর্যাদা অব্যাহত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। আমাদের রব ﷻ কিয়ামাতের দিন মানুষকে সমবেত করবেন। এ সমাবেশ মসজিদে হারাম, মক্কা মুকাররমা কিংবা মদীনার ভূখণ্ডে হবে না। এ সমাবেশ হবে বাইতুল মুকাদ্দাসে, শামের ভূখণ্ডে। আমাদের রসুল ﷺ শুধু সে ভূখণ্ডকেই মর্যাদা দেননি। সেখানে বসবাসকারী মানুষের মার্যাদাও সমুন্নত করেছেন। দূর ভবিষ্যতের সংবাদ বহনকারী এক হাদীসে রসুল ﷺ বলেন–

> আমার উম্মতের একটি দল সবসময় হকের উপর অবিচল থেকে জিহাদ করে যাবে। কিয়ামত অবধি তারা হবে বিজয়ী।
>
> [মুসলিম : ৫০৬৩]

সবসময় মুমিনদের একটি দল এখানে ইসলামের ঝাণ্ডা তুলে রাখবেন। ইসলামের ঝাণ্ডা কখনও ভূপাতিত হবে না। এটা রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে দেওয়া অঙ্গীকার। একাধিক হাদীসে যার সুসংবাদ দিয়েছেন আমাদের হাবীব ﷺ। অপর বর্ণনায় এসেছে–

> আমার উম্মতের একটি দল সবসময় দীনের উপর অটল থাকবে। তাদের শত্রুদের উপর তারা বিজয়ী হবে। তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তবে কিছু সংকট ও অসুখ-বিসুখে তারা আক্রান্ত হবে। এক পর্যায়ে আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) চলে আসবে। কিন্তু তারা আপন অবস্থায়ই থাকবে। সাহাবীরা বলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! তারা কোথায় থাকবেন? তিনি বললেন, তারা বাইতুল মুকাদ্দাস ও বাইতুল মুকাদ্দাসের আশপাশে থাকবেন। [মুসনাদু আহমাদ : ২২৩২০]

অর্থাৎ ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে– আল-কুদস ও তার আশপাশে। অতএব, আল-কুদসের আশপাশের ভূখণ্ড 'রিবাতের ভূখণ্ড'। ইতিহাসের পাতায় তাকালেই আমরা যা দেখতে পাই।

এখন আমরা ফিলিস্তিনের ইতিহাসের মধ্যে ডুবে আছি। আমরা দেখছি, পূর্ববর্তী নবীদের যুগে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ঘটে যাওয়া রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। হক ও বাতিলের সংঘাত ছিল সব নবীর যুগে। আমাদের নবী ﷺ-এর যুগেও। পরবর্তী ইসলামী বিজয়ের যুগেও। এখন আমাদের বর্তমান যুগেও। এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের পাড়ি দিতে হবে বিভিন্ন স্তর। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড সত্য ও মিথ্যার চিরন্তন সংঘাতের এক কেন্দ্রবিন্দু। এজন্য আল্লাহ ﷻ এখানে এমন কিছু বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন, যারা সবসময় ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখেন। কখনও তা ছাড়েন না। মসজিদে আকসার বরকত ছেয়ে আছে পুরো শাম জুড়ে।

একদিন রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন—

> সুসংবাদ শামের জন্য। জিজ্ঞাসা করা হয়, রসুলাল্লাহ! কেন? তিনি বলেন, রহমান (আল্লাহ)-এর ফেরেশতারা তাদের উপর নিজেদের ডানা বিছিয়ে রাখেন। [তিরমিযী : ৩৯৫৪]

শামকে আল্লাহর ফেরেশতারা ছায়া দিয়ে রাখেন। পুরো শামকে ছায়া দিয়ে রাখেন তারা। আর শামের কেন্দ্র হচ্ছে আল-কুদসের বাইতুল মুকাদ্দাস ও মসজিদে আকসা। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। প্রমাণহিসাবে আমরা এখানে রসুল ﷺ-এর কয়েকটি হাদীস তুলে ধরব। আল-কুদস, বাইতুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ফযীলত নিয়ে মোটা মোটা বই-পুস্তক রচিত হয়েছে। বেশি জানার ইচ্ছা থাকলে সেগুলো দেখা যেতে পারে।

যেন ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড সম্পর্কে রসুল ﷺ-এর কথা, সেখানকার বাসিন্দাদের সম্পর্কে তাঁর প্রশংসা এবং শাম ভূখণ্ডের মর্যাদা নিয়ে তাঁর বর্ণনা যথেষ্ট ছিল না। এজন্য আমাদের রব স্বয়ং নবী ﷺ-কে সেখানে পাঠান। যাতে তাঁর যিয়ারতের মাধ্যমে এর মর্যাদা ও সম্মান আরও বেড়ে যায়। এক অলৌকিক মুজিযার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ তাঁকে সেখানে পাঠান। ইসরা ও মিরাজের মুজিযা। আমরা সবাই ইসরা ও মিরাজ সম্পর্কে অবগত। এ বিষয়ে অগণিত প্রমাণ বিদ্যমান।

ইসরা ও মিরাজের সময়কাল নির্ধারণ নিয়ে মানুষের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে তা মক্কী জীবনে সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত। নবুওয়তের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ বছর– এ তিনটি মত পাওয়া যায়। তবে অধিক বিশুদ্ধ মত হল নবুওয়তের দ্বাদশ বছর আকাবার প্রথম বাইআত ও দ্বিতীয় বাইআতের মধ্যবর্তী সময়ে। আমার কাছে এই মতটিই অধিক বিশুদ্ধ মনে হয়।

রসুল ﷺ জাগ্রতাবস্থায় সশরীরে নিজের বিছানা ত্যাগ করে ইসরায় গমন করেন। তাকে কুদরতীভাবে প্রথমে মসজিদে আকসায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ঊর্ধ্ব জগতে। সবশেষে আবার বিছানায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখনও তার বিছানা উষ্ণ ছিল। কিছু মানুষের ধারণা, রসুল ﷺ-এর মিরাজ হয়েছে রুহের মাধ্যমে; সশরীরে নয়। এসব লোক পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের এই কথার কাছে পরাজিত যে, এটা কিভাবে হতে পারে, রসুল ﷺ এখান থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস চলে যান। এরপর আসমানপানে। এরপর আবার ফিরে আসেন। এতকিছু রাতের সামান্য এক অংশে?

আমরা তাদেরেকে বলব, কে তাঁর ইসরা করিয়েছেন? *পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি নিজের বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন।* [সুরা বনী ইসরাইল : ১] যখন আপনি সেই মহান সত্তার ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা করবেন, তখন সবই আপনার কাছে ক্ষুদ্র মনে হবে। যেমন আবু বকর সিদ্দীক ﷺ বলেছিলেন, মুহূর্তে আগত আসমানের সংবাদ সম্পর্কে আমি তাঁকে বিশ্বাস করি। অর্থাৎ জিবরাঈল ﷺ আসমান থেকে জমীনে অবতরণ করেন। এরপর আল্লাহর কাছে চলে যান। এরপর আবার ফিরে আসেন। এসবই ঘটে মুহূর্তের মধ্যে। এক সেকেন্ডে; অথবা আরও কম সময়ে। তবুও আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি। তা হলে এই সংবাদে কি আমরা তাঁকে বিশ্বাস করব না? এটাই হল মুমিনের একীন।

যাইহোক, ইসরায় রসুল ﷺ মসজিদে আকসা পৌঁছেন। এখানে আমরা সামান্য বিরতি নিব এবং জানার চেষ্টা করব, কেন এই ইসরার আয়োজন? যদি এই বিস্ময়কর ভ্রমণের উদ্দেশ্য হয় জান্নাত ও জাহান্নাম

পরিদর্শন, অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে জানা ও আসমানে নবীদের সাথে সাক্ষাৎ এবং রব্বুল ইজ্জতের সাথে মুলাকাত, তা হলে আকসায় এ 'বিরতি' কেন? কেন মক্কার পবিত্র কাবা থেকে সরাসরি তাঁকে আসমানে তুলে নেওয়া হয়নি? কতিপয় মুফাসসির এর উত্তরে বলেন, নবীদের সাথে সাক্ষাতের জন্য। যদি বিষয়টি এমনই হত, তা হলে তো আল্লাহ ﷻ সমস্ত নবীকে মক্কায়ও নিয়ে আসতে পারতেন। নিঃসন্দেহে মক্কা আল-কুদস থেকে অধিক সম্মানিত। আর মসজিদে হারাম মসজিদে আকসার চেয়ে বেশি সম্মানিত। তা হলে কেন এই ঘুর্ণায়ন? এই ঘুর্ণায়নের পেছনে রয়েছে অনেক উদ্দেশ্য ও হেকমত। সেগুলো থেকে আমি দুটি হেকমত তুলে ধরছি–

প্রথম হেকমত : বিশ্ব মানবতার নেতৃত্বের চাবিকাঠি অর্পণ। কেননা, ধর্মের দিক দিয়ে মানব কাফেলা পরিচালিত হত ফিলিস্তিন থেকে। পূর্ববর্তী নবীরা, বনী ইসরাইলের নবীগণ এবং খ্রিস্টানদের নবী ঈসা ﷺ এখানেই প্রেরিত হয়েছিলেন। বিশ্বের ধর্মীয় পরিচালনা এবং আল্লাহ ﷻ-র একত্ববাদের সূচনা এই ভূমি থেকে। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড থেকে। এখন নেতৃত্ব মুসলিম উম্মাহর দিকে স্থানান্তরিত হবে– দুনিয়ার শেষ উম্মত, যাদের কাছে সর্বশেষ নবী প্রেরিত হয়েছেন, যাদেরকে দেওয়া হয়েছে সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন, রবের পক্ষ থেকে বান্দাকে প্রদত্ত চূড়ান্ত জীবনবিধান, বান্দার জীবনে বিচারক হিসাবে যেটা রব মনোনীত করেছেন– কাজেই রসুল ﷺ-কে কিয়ামত অবধি পুরো দুনিয়ার নেতৃত্বের চাবি গ্রহণ করার জন্য সেই স্থানে যেতে হয়, যেই স্থানটা শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে দুনিয়াকে পরিচালনা করে আসছে।

দ্বিতীয় হেকামত : কিয়ামত পর্যন্ত মুমিনদের দৃষ্টিতে আকসা ও ফিলিস্তিনের মর্যাদা সমুন্নত করা। কেননা, এটা প্রথম কিবলা। মসজিদে আকসায় সালাত আদায় করলে অন্যান্য মসজিদের তুলনায় ৫০০ গুণ বেশি সওয়াব হয়। মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী আর এই মসজিদে আকসা বাদে আর কোনো মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সফর নিষিদ্ধ। উপরন্তু সেখানে রসুল ﷺ-এর ইসরা সংঘটিত

হয়। যাতে সেটা নবীজী ﷺ-এর ইসরার ভূমিতে পরিণত হয়। সমস্ত মুসলমানের কাছে তা হয় সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। প্রতিবছর অন্তত একবার হলেও যাতে তারা একে স্মরণ করে এবং এর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। যখন আমরা ইসরা ও মিরাজ নিয়ে আলোচনা করি, তখন আকসা ও ফিলিস্তিনের কথা এড়িয়ে যাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। তা ছাড়া যেহেতু আল্লাহ ﷻ-এর ইলমে আগে থেকেই ছিল যে, এক সময় এই স্থানটি হবে সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু– পারস্য, রোমান, ক্রুসেডার, তাতার, ব্রিটিশ ও ইহুদীসহ আমাদের পরিচিত ও অপরিচিত সকলেই এ ভূখণ্ডের প্রতি লালায়িত হবে। সকলের লোলুপ দৃষ্টি থেকে এই মহান মসজিদ এবং এই মহান ভূখণ্ডের হেফাযতের প্রতি মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই ছিল এই প্রয়াস।

ফিলিস্তিন ও বাইতুল মুকাদ্দাসের মর্যাদা এখানেই সীমিত নয়। সুরা ইসরা তিলাওয়াত করলে দেখা যায় যে, প্রথম আয়াতেই ইসরা ও মিরাজের আলোচনা এসেছে। কয়েক আয়াত পরই এসেছে বনী ইসরাইল কর্তৃক এই ভূখণ্ডে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর আলোচনা। কোনো সন্দেহ নেই যে, এই দুইয়ের মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট সম্পর্ক। ইসরা ও মিরাজ সম্পর্কে আলোচনা, মুমিন ও মুসলমানদের আকসা ও তার আশপাশের বরকতময় ভূখণ্ডে অন্তর্ভুক্তি, বনী ইসরাইল ও ইহুদীদের এই ভূখণ্ডে ধ্বংসযজ্ঞ সঞ্চালন– এগুলো সবই গভীর সম্পৃক্তিমূলক প্রসঙ্গ।

আমাদের রব আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে, এ স্থান নিয়ে সংঘাত-সংগ্রাম, যুদ্ধ-বিগ্রহ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। হাঁ, কখনও কখনও মুসলমান অন্য শত্রুদের মধ্যে সংঘাত হবে। শত্রুদের মধ্যে থাকবে রোমান, ক্রুসেডার ও অন্যরা। কিন্তু ইহুদীদের দাবি, বা এই ভূখণ্ড নিয়ে মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের লড়াই চলবে কিয়ামত পর্যন্ত।

এই উম্মতের সময় যেসব ঘটনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে, সেগুলোর প্রতি যারা নজর রাখেন, তারা সুরা বনী ইসরাইলে বর্ণিত এই বিষয়টি ভালো করেই বোঝেন। ইহুদীরা মসজিদে আকসার জায়গায় বা তার নীচে টেম্পল দাবি করে। তাদের ভাষ্যমতে এটা তাদের আকিদা, যা নিতান্তই বিকৃত। আমাদের আকিদা হচ্ছে মসজিদে আকসা

সেটাই, যেখানে ইসরার সময় রসুল ﷺ-কে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এটাই সেই সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন স্থান, যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। ওটা তাদের আকিদা; আর এটা আমাদের আকিদা। এখানে আকিদার মোকাবেলায় আকিদার সংঘাত। তারা বলে তাদের টেম্পল। আমরা বলি আমাদের মসজিদ। সুতরাং গুরুত্ব শুধু মসজিদে আকসা, লিফিস্তিন বা সেখানকার অধিবাসীদের ঘিরে নয়; অথবা সেখানে ভবিষ্যতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নয়; বরং রসুল ﷺ তার মক্কার জীবনেও এখানে বিদ্যমান বিশ্বশক্তি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। যেমন আমরা আগেই আলোচনা করেছি। রোম ও পারস্য বাইতুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড নিয়ে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল। এই বৃহৎ শক্তিদ্বয়ের মাঝে বিরাজমান সংঘাত রসুল ﷺ এবং সাহাবীদেরকেও ভাবিয়ে তোলে। অথচ রসুল ﷺ তখন মক্কা মুকাররামায় ছিলেন এবং তখন খুব নগণ্যসংখ্যক মুমিন ছিল তাঁর সাথে। কোথায় রোম ও পারস্যের শক্তি, আর কোথায় সেসময়কার মুসলমানদের শক্তি? এই দুটি বিশ্বশক্তির সাথে তৎকালীন মুসলমানদের শক্তির কোনো প্রকারে তুলনা করা যায় না। তবুও রসুল ﷺ আকসার পবিত্র ঘর ও ফিলিস্তিনের বরকতময় ভূখণ্ড ঘিরে বিশ্বশক্তি-দ্বয়ের সংঘাত নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। যখন পারস্য রোমের খ্রিস্টানদের উপর বিজয়ী হয়, তখন কী ঘটেছিল?

রসুল ﷺ ও তাঁর সাহাবীরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। মুশরিকরা আনন্দিত হয়ে ওঠে। রসুল ﷺ চিন্তিত হন, কারণ এখানে পরাজিত শক্তি ছিল আহলে কিতাব। তারা সেই খ্রিস্টান সম্প্রদায়, যারা তৎকালীন ফিলিস্তিন শাসন করত। যদিও তাদের মধ্যে ছিল প্রচুর বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা। তাদের আকিদা-বিশ্বাস ও বিশুদ্ধ আকিদার মধ্যে ছিল বিরাট ব্যবধান। তবুও নবীজী ﷺ চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ, তারা অগ্নিপূজক পারসিকদের চেয়ে মুমিনদের বেশি নিকটবর্তী ছিল। অপর দিকে মুশরিকদের আনন্দের কারণ ছিল, পারসিকরা ছিল তাদের মতই পৌত্তলিক। তারা পারস্যের বিজয়কে পৌত্তলিকতার বিজয় হিসাবেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু তখনই নাযিল হয় আমাদের রবের বার্তা–

> রোম পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী ভূখন্ডে। আর তারা পরাজয়ের পর সত্বর বিজয়ী হবে। [সুরা রুম : ২, ৩]

এটা আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য সুসংবাদ যে, রোমানরা সত্বর অগ্নিপূজক পারসিকদের উপর বিজয়ী হবে। মুসলমানরা এই সুসংবাদ গ্রহণ করেন এবং দৃঢ়ভাবে এর উপর ঈমান আনেন। এমনকি আবু বকর সিদ্দীক ﷺ ভবিষ্যতের এ বিজয়ের উপর এক মুশরিকের সাথে বাজিও ধরেন। ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন–

> মুসলমানরা পারস্যের উপর রোমের বিজয় কামনা করতেন। কেননা, রোমানরা ছিল আহলে কিতাব। পক্ষান্তরে মুশরিকরা রোমানদের উপর পারসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা, পারসিকরা ছিল তাদের মত মূর্তিপূজক। মুসলমানরা বিষয়টি নিয়ে আবু বকর ﷺ-এর সাথে আলোচনা করেন। আবু বকর ﷺ বিষয়টি তুলে ধরেন রসুল ﷺ-এর কাছে। নবী ﷺ তখন তাদের বলেন, কোনো সন্দেহ নেই যে, পারসিকরা পরাজিত হবে।
> এরপর আবু বকর ﷺ বিষয়টি মুশরিকদের সাথে আলোচনা করেন। মুশরিকরা বলল, আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করো। যদি রোমান জিতে যায়, তা হলে তোমাকে এই পরিমাণ দেওয়া হবে। আর যদি পারস্য বিজয়ী হয়, তা হলে তুমি আমাদেরকে এই পরিমাণ দিবে। আবু বকর ﷺ তাদেরকে পাঁচ বছরের সময়সীমার কথা জানান। কিন্তু এই পাঁচ বছরে রোমানরা বিজয়ী হয় না। আবু বকর ﷺ বাজির বিষয়টি নবীজী ﷺ-কে জানান। নবীজী ﷺ তাকে বললেন, তুমি কেন অনূর্ধ্ব দশ বছর সময় নিলে না। [তবারানী : ১২৩৭৭]

৭ বছর মতান্তরে ৯ বছরের মধ্যেই ফিলিস্তিন ভূখন্ডে পারসিকদের উপর রোমানরা বিজয় অর্জন করে। ফিলিস্তিন ভূখন্ড আবার রোমানদের শাসনাধীনে চলে আসে। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত এ ভূখন্ড রোমানদের অধীনেই থাকে।

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, রসুল ﷺ ফিলিস্তিনের ঘটনা প্রবাহের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। অথচ তিনি থাকতেন মক্কায়।

কিন্তু যেহেতু খ্রিস্টানরা অনেক হেরফের ও রদবদল করেছিল এবং সঠিক আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল, এজন্য রসুল ﷺ মুমিনদের মনে একথা বোপন করতে চেয়েছিলেন যে, এই বরকতময় ভূখণ্ড আর বেশিদিন খ্রিস্টানদের কাছে থাকবে না, যারা তাদের শরীয়ত বদলে ফেলেছে। যারা তাদের নবী ঈসা ﷺ-এর কথা মানে না এবং যারা তাদের নবীর ভবিষ্যদ্বাণী– শেষ নবী হক এবং তিনি প্রেরিত হলে তাঁকে তোমাদের মানতে হবে– অমান্য করে। এজন্য আহযাব যুদ্ধের দিন রসুল ﷺ সাহাবীদের সুসংবাদ দেন যে, সমগ্র শাম ভূখণ্ড অচিরেই ইসলামের কাছে বিজিত হবে।

আহযাব যুদ্ধের সময় খন্দক খননকালে যখন সাহাবীদের সামনে বিরাট এক পাথর প্রকাশ পায়, তখন তারা রসুল ﷺ-এর কাছে যান। কোদাল আনা হয়। নবীজী ﷺ পাথরে আঘাত করে চূর্ণ করতে আরম্ভ করেন। তখন তিনি ﷺ বলেন–

> আল্লাহু আকবার। আমাকে শামের চাবিকাঠি দেওয়া হল। আল্লাহর কসম! আমি আমার এখান থেকে শামের সাদা প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি। [মুসনাদু আহমাদ : ১৮৭১৬]

আহযাব যুদ্ধের দিন তারা মদীনা মুনাওয়ারায় কাফেরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি সাহাবীদের সুসংবাদ শুনিয়েছেন, অচিরেই এমন দিন আসবে, যখন শেষ নবীর অনুসারী মুসলমানরা ফিলিস্তিন ভূখণ্ড জয় করবে এবং ইসলামের আলোকে তা শাসন করবে।

রসুল ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল তাদের মনে একথা বদ্ধমূল করা যে, ফিলিস্তিন আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য হাদিয়া। যারা আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ করবে, এ ভূখণ্ড তাদেরকেই দেওয়া হবে। যারা সীমালংঘন করবে, তাদের থেকে এ ভূখণ্ড ছিনিয়ে নেওয়া হবে। যখন খ্রিস্টানরা আল্লাহর দেওয়া শরীয়ত পরিবর্তন করে, তখন তাদের থেকে এ ভূখণ্ড ছিনিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। চাই তারা পারসিকদের উপর যত বড় বিজয়ই অর্জন করুক না কেন। অথচ তারা ছিল তৎকালীন দুনিয়ার দুই পরাশক্তি। রোমানদের থেকেও তা ছিনিয়ে

নেওয়া হবে এবং মুমিনদের হাতে সোপর্দ করা হবে। যদিও তারা সংখ্যায় স্বল্প এবং শক্তিতে দুর্বল।

রোম পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী ভূমিতে। [সুরা রোম : ২, ৩]

আয়াতে উল্লিখিত 'আদনা' শব্দের মধ্যে রয়েছে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। আধুনিক যুগে বিশেষজ্ঞগণ প্রমাণ করেছেন যে, এ 'আদনাল আরদ' হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের মাপকাঠিতে দুনিয়ার সর্বনিম্ন স্থান। এটাই সেই জায়গা, যেখানে রোমান বাহিনী পরাজিত হয়েছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই 'আদনাল আরদ' প্রায় চারশত মিটার নীচে অবস্থিত। নিঃসন্দেহে এটা কুরআনের এক অলৌকিক বিস্ময়।

ষষ্ঠ হিজরী সনের শেষের দিকে হুদায়বিয়া সন্ধির পর রসুল ﷺ দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমারা ও নেতৃবৃন্দের কাছে পত্র প্রেরণের উদ্যোগ নেন। ফিলিস্তিন ও তার আশপাশের শাম ভূখণ্ডের শাসকবৃন্দও এ তালিকায় ছিল। তৎকালীন ফিলিস্তিন ছিল রোমানদের শাসনাধীন। গাসসানীরা ছিল এখানকার আঞ্চলিক শাসক। তারা ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অনুগত এক খ্রিস্টান সম্প্রদায়।

রসুল ﷺ যাদের কাছে বার্তা প্রেরণ করেন, তাদের অন্যতম হলেন তৎকালীন রোমের শাসক হিরাক্লিয়াস। এমনইভাবে দামেশক ও তার আশ-পাশের ফিলিস্তিন ও শাম ভূখণ্ডের অধিপতি গাসসানী বাদশাহ শুরাহবীল ইবনু আমর গাসসানীর কাছেও তিনি বার্তা পাঠান। সেই পত্রাবলিতে তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন।

আমরা সবাই সেই বার্তা সম্পর্কে অবগত আছি, যা রসুল ﷺ হিরাক্লিয়াস ও দুনিয়ার অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠিয়েছিলেন। যখন হিরাক্লিয়াসের কাছে রসুল ﷺ-এর পত্র পৌঁছে, তখন তিনি রসুলের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে আগ্রহী হন। কারণ, রসুল ﷺ উল্লেখ করেছিলেন যে, তিনি নবী এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রসুল। হিরাক্লিয়াস কোনো আরবের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চান। আবু সুফ্ইয়ান তখন ব্যবসায়িক কাজে শাম অঞ্চলে ছিলেন। রসুলের আবির্ভাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য

লোকজন তাঁকে হিরাক্লিয়াসের কাছে নিয়ে আসে। তখন সেই বিখ্যাত সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বর্ণনা করেন যে, আবু সুফইয়ান ইবনু হারব তাকে বলেছেন—

রাজা হিরাক্লিয়াস একবার তাঁর কাছে লোক প্রেরণ করেন। তিনি তখন ব্যবসা উপলক্ষে কুরাইশদের কাফেলায় শামে ছিলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ সে সময় আবু সুফইয়ান ও কুরাইশদের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধিতে আবদ্ধ ছিলেন। আবু সুফইয়ান তার সাথীসহ হিরাক্লিয়াসের কাছে আসেন। তখন হিরাক্লিয়াস জেরুযালেমে ছিলেন। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠান। তাঁর কাছে তখন রোমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে কাছে ডেকে নেন এবং দোভাষী তলব করেন। এরপর জিজ্ঞেস করেন, এই যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবি করেন— তোমাদের মধ্যে বংশের দিক থেকে তাঁর সবচেয়ে নিকটবর্তী কে? আবু সুফইয়ান বলেন, আমি বললাম, বংশের দিক দিয়ে আমিই তাঁর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী। তিনি বললেন, একে আমার কাছে আনো এবং তাঁর সাথীদেরকেও কাছে এনে তার পেছনে বসিয়ে দাও।

এরপর তাঁর দোভাষীকে বললেন, তাদের বলে দাও, আমি এর কাছে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করব, যদি সে আমার কাছে মিথ্যা বলে, সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তাকে মিথ্যুক বলবে। আবু সুফ্ইয়ান বলেন, আল্লাহর কসম! আমার যদি এ লজ্জা না থাকত যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে, তবে আমি অবশ্যই তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।

এরপর তিনি তাঁর সম্পর্কে আমাকে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন করেন তা হল, বংশমর্যাদার দিক দিয়ে তিনি তোমাদের মধ্যে কেমন? আমি বললাম, তিনি আমাদের মধ্যে খুব সম্ভ্রান্ত বংশের। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এর আগে আর কখনও কেউ কি এমন কথা বলেছে? আমি বললাম, না।

তিনি বললেন, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিলেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সম্ভ্রান্ত মর্যাদাবান শ্রেণির লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, নাকি দুর্বল লোকেরা? আমি বললাম, দুর্বল লোকেরা। তিনি বললেন, তাদের সংখ্যা কি বাড়ছে, না কমছে? আমি বললাম, তারা বেড়েই চলেছে। তিনি বললেন, তাঁর ধর্মে প্রবেশ করে কেউ কি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তার দাবির আগে তোমরা কি কখনও তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছ? আমি বললাম, না।

তিনি বললেন, তিনি কি সন্ধি ভঙ্গ করেন? আমি বললাম, না। তবে আমরা তাঁর সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সন্ধিতে আবদ্ধ আছি। জানি না, এর মধ্যে তিনি কী করবেন। আবু সুফ্ইয়ান বলেন, একথাটি ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে আর কোন কথা যোগ করার সুযোগই আমি পাইনি। তিনি বললেন, তোমরা কি তাঁর সঙ্গে কখনও যুদ্ধ করেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, তাঁর সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধের পরিণাম কি হয়েছে? আমি বললাম, তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কুপের বালতির মত। কখনও তাঁর পক্ষে যায়, আবার কখনও আমাদের পক্ষে আসে।

তিনি বললেন, তিনি তোমাদের কীসের আদেশ দেন? আমি বললাম, তিনি বলেন, তোমরা এক আল্লাহর এবাদত করো এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করো না এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা বলে, তা ত্যাগ করো। আর তিনি আমাদেরকে সালাত আদায়, সত্য বলা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা এবং আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচরণ করার নির্দেশ দেন।

এরপর তিনি দোভাষীকে বলেন, তুমি একে বলো, আমি তোমার কাছে তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তুমি তার জওয়াবে উল্লেখ করেছ যে, তিনি তোমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের। প্রকৃতপক্ষে রসূলদেরকে তাঁদের কওমের উচ্চ বংশেই পাঠানো হয়ে থাকে। তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, একথা তোমাদের মধ্যে ইতোপূর্বে আর কেউ বলেছে কিনা? তুমি বলেছ, না। তাই আমি

বলছি, আগে যদি কেউ এমন বলত, তা হলে আমি অবশ্যই বলতাম, ইনি এমন এক ব্যক্তি, যিনি তাঁর পূর্বসূরির কথার অনুসরণ করছেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিলেন কি না? তুমি তার জওয়াবে বলেছ, না। তাই আমি বলছি, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে যদি কোনো বাদশাহ থাকতেন, তবে আমি বলতাম, ইনি এমন এক ব্যক্তি, যিনি তাঁর বাপ-দাদার বাদশাহী ফিরে পেতে চান। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, এর আগে কখনও তোমরা তাঁকে মিথ্যায় অভিযুক্ত করেছ কি না? তুমি বলেছ, না। এতে আমি বুঝলাম, এমনটি হতে পারে না যে, কেউ মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা পরিত্যাগ করবে, আর আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, সম্ভ্রান্ত লোকজন তাঁর অনুসরণ করে, না সাধারণ লোক? তুমি বলেছ, সাধারণ লোকজন তাঁর অনুসরণ করে। আর বাস্তবে এই শ্রেণির লোকেরাই হন নবী-রসূলের অনুসারী। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা সংখ্যায় বাড়ছে, না কমছে? তুমি বলেছ, বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানে পূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত এ রকমই হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর দীনে প্রবেশ করে কেউ কি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে? তুমি বলেছ, না। ঈমানের স্নিগ্ধতা অন্তরের সঙ্গে মিশে গেলে এমনই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি সন্ধি ভঙ্গ করেন কিনা? তুমি বলেছ, না। প্রকৃতপক্ষে রসূলগণ এমনই, সন্ধি ভঙ্গ করেন না।

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি তোমাদের কীসের আদেশ দেন? তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের এক আল্লাহর বন্দেগী করা ও তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুর শরীক সাব্যস্ত না করার নির্দেশ দেন। তিনি তোমাদের নিষেধ করেন মূর্তিপূজা করতে, আর তোমাদের আদেশ করেন সালাত আদায় করতে, সত্য বলতে ও সচ্চরিত্র থাকতে। তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার এই দুই পায়ের নীচের জায়গার অধিকারী হবেন। আমি নিশ্চিত জানতাম, তাঁর আবির্ভাব হবে; কিন্তু তিনি যে তোমাদের মধ্য থেকে হবেন,

> একথা ভাবতে পারিনি। যদি জানতাম, আমি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারব, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি যে কোনো কষ্ট সহ্য করতাম। আর আমি যদি তাঁর কাছে থাকতাম, তবে অবশ্যই তাঁর পা ধৌত করে দিতাম। [বুখারী : ২৯৪১]

এই সংলাপে হিরাক্লিয়াস নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন করেন। এগুলো তাওরাত ও ইঞ্জিলে বিদ্যমান রসুল ﷺ-এর নির্দশন ও বৈশিষ্ট্য। শেষ যামানায় প্রেরিত নবীর গুণাবলি। হিরাক্লিয়াস ইসলাম গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন যে, এতে তার রাজত্ব চলে যাবে এবং রোমান ভূখণ্ডের জনতা তাকে হত্যা করে ফেলবে। দেখতে পান বেশিরভাগ পাদ্রী নবীজী ﷺ-এর বিপক্ষে। রাজত্বের জন্য শঙ্কিত হয়ে পড়েন। শেষে তিনি রাজত্ব আকড়ে ধরেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী– এ ব্যাপারে পরিপুর্ণ বিশ্বাস থাকার পরও তাকে অস্বীকার করেন। এটাই ছিল হিরাক্লিয়াসের অবস্থান। তিনি রসুল ﷺ-এর দূতকে হাদিয়া-উপঢৌকন দিয়ে ফিরিয়ে দেন। তবে অনুসারীদের ভয়ে ঈমানে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন।

তৎকালীন দামেশকের শাসক শুরাহবীল ইবনু আমর গাসসানী কী করেছিলেন?

শুরাহবীল ইবনু আমর গাসসানীর কর্মকাণ্ডের মোকাবেলায় রসুল ﷺ-এর জওয়াব কী ছিল?

রসুলুল্লাহর পত্র পেয়ে শুরাহবীল ইবনু আমর গাসসানীর কাণ্ড

ফিলিস্তিন, দামেশক ও পার্শ্ববর্তী শামের ভূখণ্ডগুলো ছিল শুরাহবীল ইবনু আমর গাসসানীর শাসনাধীন। সে ছিল তৎকালীন রোম সম্রাট সিজার হিরাক্লিয়াসের অনুগত শাসক। শুরাহবীল ইবনু আমর গাসসানীর কাছে রসুল ﷺ-এর দূত ছিলেন হারিস ইবনু আমর আসাদী। তিনি সেই বার্তাই বহন করেছিলেন, যা দুনিয়ার অন্যান্য রাজা-বাদশাহ ও নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠানো হয়েছিল। শুরাহবীল ইবনু আমর গাসসানী এমন এক কাজ করেছিল যা অন্য কোনো রাজা-বাদশাহ করেনি। যা ছিল তৎকালীন আন্তর্জাতিক পররাষ্ট্রনীতির সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

সে দূতকে বন্দী করে হত্যা করে ফেলে। এ ছিল চরম অন্যায় ও ধৃষ্টতা। সার্বজনীন নীতি হচ্ছে দূত হত্যা নিষিদ্ধ। রসুল ﷺ-এর কাছে মুসাইলামাহ কাজ্জাবের পক্ষ থেকে দুইজন দূত এসেছিল। তারা আগে মুসলমান হয়েছিল। পরে ইসলাম ত্যাগ করে মুসায়লামাহর দলে চলে যায়। তাদের রক্ত ছিল হালাল। কেননা, আমাদের ধর্মে মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তবুও তারা যেহেতু মুসায়লামাহ কাজ্জাবের দূত হিসাবে এসেছিল, তাই রসুল ﷺ তাদেরকে বলেন, 'তোমরা যদি দূত না হতে, তা হলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতাম।' দূত হওয়ার সুবাদে সেদিন তারা বেঁচে যায়। কিন্তু শুরাহবীল ইবনু আমর যা করে, তা ছিল সমস্ত নীতির লঙ্ঘন। ইসলামী সাম্রাজ্যের এক প্রজাকে সে হত্যা করে। তিনি রসুল ﷺ-এর দূত। হারিস ইবনু উমাইর আসাদী ﷺ। রসুল ﷺ এ ধৃষ্টতার কী জওয়াব দিয়েছিলেন?

রসুল ﷺ এ ধৃষ্টতাকে মুসলিম উম্মাহর মর্যাদাহানী বলে বিবেচনা করেন। এ ঘটনা ঘটেছিল অষ্টম হিজরী সনে। মক্কা বিজয়ের আগে। ইসলামী সাম্রাজ্য তখনও সম্প্রসারিত হয়নি। তখনও সেটা ছিল মদীনা ও আশপাশের কিছু গোত্র নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র একটি রাষ্ট্র। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, এ ধৃষ্টতার জওয়াব দিতে হবে শক্তির মাধ্যমে। তিনি তিন হাজার মুজাহিদের সমন্বয়ে একটি পরিপূর্ণ বাহিনী গঠন করেন। শুরাহবীল ইবনু আমর গাসসানী থেকে দূত হত্যার কিসাস গ্রহণের জন্য। রসুল ﷺ ভ্রুক্ষেপও করেননি যে, শুরাহবিলের সাথে রয়েছে পুরো গাসসানী জনগোষ্ঠী। তাদের পশ্চাতে রয়েছে বিরাট রোম সাম্রাজ্য। যারা পারস্যের সাথে তৎকালীন দুনিয়াটাকে বাটোয়ারা করে নিয়েছিল। তিনি শুধু ইসলামী রাষ্ট্রের মর্যাদার দিকেই লক্ষ করেন। শুধু মুসলিম উম্মাহর সম্মান নিয়ে চিন্তা করেন। শুধু সেই শহীদের কথা ভাবেন, ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে যার রক্ত ঝরেছে। এজন্য তিনি পুরো বাহিনী প্রেরণ করেন। একটু ভাবুন, আজ ফিলিস্তিন ও দুনিয়ার অন্যান্য ভূখণ্ডে কীভাবে মুসলমানদের মর্যাদাহানী করা হচ্ছে। অথচ মুসলমানদের কোনো লশকর সক্রিয় হচ্ছে না। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

তিন হাজার মুজাহিদ নিয়ে গঠিত ইসলামী বাহিনী বেরিয়ে পড়ে। প্রথম হিজরী সনে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের সূচনার পর অষ্টম হিজরী সন বা সপ্তম হিজরী সনের শেষ পর্যন্ত এটাই ছিল সবচেয়ে বড় ইসলামী বাহিনী। এ বহিনীর সেনাপতি ছিলেন যায়দ ইবনু হারিসাহ ﵁। তিনি নিহত হলে নেতৃত্ব দিবেন জাফর ইবনু আবু তালিব ﵁। তিনি নিহত হলে নেতৃত্ব দিবেন আব্দুল্লাহ ইবনু রওয়াহা আনসারী ﵁। তিনিও যদি নিহত হয়ে যান তা হলে মুসলমানরা পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে তাদের আমীর নির্বাচন করে নিবেন। ইতিহাসে এ যুদ্ধটি সারিয়ায়ে মুতা বা গাজওয়ায়ে মুতা নামে পরিচিত। রসুল ﷺ এ যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও একে 'গাযওয়া' বলা হয়। কারণ, বাহিনীর আকার ছিল অনেক বড়।

গাসসানীদের সাথে লড়াই এবং হারেস ইবনু উমাইর আসাদীর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিন হাজার মুজাহিদের এ বাহিনী যখন বের

হয়, তখন এক লক্ষ যোদ্ধা নিয়ে গাসসানীরা মুসলমানদের মোকাবেলায় এগিয়ে আসে। তাদের সহায়তার জন্য রোমান রাজা আরও এক লক্ষ যোদ্ধা প্রেরণ করে। মাত্র তিন হাজার মুসলিম মুজাহিদের মোকাবেলায় দুই লক্ষ খ্রিস্টান যোদ্ধা ময়দানে অবতরণ করে। যুদ্ধ শুরু হয়। যায়দ ইবনু হারিসাহ, জাফার ইবনু আবু তালিব ও আব্দুল্লাহ ইবনু রওয়াহা ﵁ শহীদ হয়ে যান। এরপর মুসলমানরা তাদের মধ্য থেকে একজনকে সেনাপতি নির্বাচন করেন। তিনি হলেন খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁। তাঁর হাতে বিজয় পূর্ণতা লাভ করে। যেমন, আমাদের রসুল ﷺ বয়ান করেছেন।

এ যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। অনেকে বলেন, মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়েছিলেন। অনেকে বলেন, বিজয়ী হয়েছিল খ্রিস্টানরা। কারও কারও মতে, কেউই বিজয়ী হয়নি। তবে আমার দৃষ্টিতে বাস্তব কথা হচ্ছে, এ যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছিলেন। এর প্রমাণ আছে অনেক। কিন্তু এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সেসব প্রমাণ বিশ্লেষণের স্থান নয়। তবে আমরা ওই যুদ্ধের ঘটনাপুঞ্জের উপর শুধু রসুল ﷺ-এর মন্তব্য উল্লেখ করব। তিনি মদীনায় অবস্থান করেই বিস্ময়করভাবে বলে দিচ্ছিলেন, মুতার ভূখণ্ডে কী কী ঘটছে। মুতা এখন জর্ডানে অবস্থিত। ঘটনার বিবরণ দিয়ে রসুল ﷺ বলছিলেন–

ঝাণ্ডা ধারণ করেছিল যায়দ ইবনু হারিসাহ, সে শহীদ হয়ে গেছে। ঝাণ্ডা ধারণ করেছিল জাফর ইবনু আবু তালিব, সে শহীদ হয়ে গেছে। আব্দুল্লাহ ইবনু রওয়াহাও ঝাণ্ডা ধারণ করে শহীদ হয়েছে। এসব মহান সাহাবীদের শাহাদাতের শোকে তার চোখ বেয়ে তখন পানি ঝরছিল। এরপর তিনি বলেন, এবার ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে আল্লাহর এক অনন্য তলোয়ার। সে হল খালিদ ইবনু ওয়ালীদ। তার হাতে আল্লাহ ﷻ বিজয় দিয়েছেন।

একথা শুধু বিজয়ের সময়েই বলা হয়। আত্মরক্ষা করে বেরিয়ে এলে একথা বলা হয় না। এর প্রমাণ হচ্ছে বেরিয়ে আসার সময় দুই লক্ষ যোদ্ধার প্রতাপশালী রোমান শক্তি তাদের পিছু নেওয়ার সাহস পায়নি।

তা ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে শহীদের সংখ্যাও ছিল ২০ এর কম। একটু চিন্তা করে দেখুন, তিন হাজারের ক্ষুদ্র একটি বাহিনী দুই লাখের সাথে যুদ্ধ করছে। অথচ তাদের মধ্যে ২০ কিংবা আরও কম ১৫/১৭ জন লোক নিহত হয়েছেন। এটাই প্রমাণ করে যে, ইসলামী বাহিনীর হাতে ছিল এ যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﷺ বেরিয়ে আসার ছক আঁকলে রোমানরা তুষ্ট হয়ে যায়। তারা পিছু ধাওয়া করতেও আসেনি। যা প্রমাণ করে, এ পরিণতি তারা মেনে নিয়েছিল।

এর আরও প্রমাণ হচ্ছে এই যুদ্ধের এক বছর পর তারা রসুল ﷺ-এর সাথে যুদ্ধ না করে তাবুকের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল! যা ছিল তাদের মুতার প্রাঙ্গণের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রভাব।

এসব কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই ইসলামী বাহিনী জর্ডানের মুতায় পৌঁছে গিয়েছিল। তৎকালীন ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের শাসক শক্তির সাথে লড়াই করতে। এ ছিল ফিলিস্তিন ও পুরো শামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ব্যাপার। এর এক বছর পর নবম হিজরীতে রসুল ﷺ তাবুক যুদ্ধে বের হন। তার বাহিনী ছিল ত্রিশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে গঠিত। শামের ভূখণ্ডে রোমানরা মদীনা মুনাওয়ারার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। যেকোনো সময় মদীনার উপর আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এজন্য রসুল ﷺ রোমানদের আগে অগ্রসর হতে থাকেন এবং বিরাট বাহিনী গঠন করে শাম অভিমুখে রওয়ানা হন। সংবাদ পেয়ে রোমান বাহিনী পালিয়ে যায়। অথচ তারা ছিল তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনী। মুস্তফা ﷺ-এর বাহিনী দেখে আতঙ্কিত হয়ে রোমান বাহিনী নবম হিজরী সনে পালিয়ে যায়। এরপর দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন গোত্র রসুল ﷺ-এর কাছে আসে কর প্রদানের শর্তে সন্ধি করতে। তাইমা, জারবা, আইলা ও উযরুহ (Udhruh)-সহ বিভিন্ন এলাকার খ্রিস্টানরা আসে। জিযিয়া প্রদানের শর্তে নবীজী ﷺ-এর সাথে সন্ধি করে তারা। তাবুক যুদ্ধের পর উত্তর আরব উপদ্বীপে ইসলাম ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এভাবে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত রসুল ﷺ ফিলিস্তিন ও শামের বিষয় নিয়ে সোচ্চার ছিলেন।

আমরা অনেকেই হয়তো, উসামা ইবনু যায়দ ﵁-এর বাহিনী সম্পর্কে অবগত আছি। যিনি ছিলেন, রসুল ﷺ-এর প্রিয়পাত্র। নবীজী ﷺ যায়দ ইবনু হারিসাহ ﵁-কে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর পুত্র উসামা ইবনু যায়দ ﵁-কেও অনেক ভালোবাসতেন। এজন্যই তাঁকে 'হিব্বু রসুলিল্লাহ' বলা হত। জীবনের শেষ মুহূর্তে নবীজী ﷺ এই নওজোয়ানের হাতে দিয়েছিলেন সেই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব, যে বাহিনী রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বের হয়েছিল। ১১ হিজরী সনের সফর মাসে এ বাহিনী প্রস্তুত করা হয়। রসুল ﷺ-এর ওয়াফাতের মাত্র এক মাস আগে।

নবীজী ﷺ নিজে এ বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। বড় বড় সাহাবীও এ বাহিনীতে বিদ্যমান ছিলেন। তবুও রসুল ﷺ নেতৃত্বের ভার দেন উসামা ইবনু যায়দকে। তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এই বাহিনীকে রওয়ানা হতেও নির্দেশ দেন। কিন্তু নবীজী ﷺ-এর অসুস্থতা ও ওয়াফাতের সংবাদ পেয়ে বাহিনী মদীনার উত্তরে যাত্রা বিরতি করে। এর মধ্যে খলীফাহিসাবে আবু বকর সিদ্দীক ﵁-এর বাইআত সম্পন্ন হয়। তিনি নিজে বাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।

এখানে আমরা উসামা ইবনু যায়দের বিষয়টি নিয়ে কিছু আলোচনা করব। উসামা ইবনু যায়দকে এ বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করাটাই প্রমাণ করে তিনি ছিলেন একজন বোধসম্পন্ন ব্যক্তি। তার পিতা যায়দ ইবনু হারিসাহ মুতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। এজন্য পিতা ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা ছিল তাঁর মধ্যে প্রবল। তাঁর অন্তরে প্রজ্জ্বলিত ছিল রোমান সাম্রাজ্য ও গাসসানীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের আগুন, যারা মুসলিম নেতৃস্থানীয়দের হত্যা করেছিল।

তবে এ ঘটনায় আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে। রসুল ﷺ এ বাহিনীতে যুব সমাজের প্রতিভা তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৭ বা ১৮ বছর বয়সী একজন তরুণের হাতে তুলে দেন এমন এক বাহিনীর নেতৃত্ব, মুসলিম উম্মাহর বীর সেনানীরাও যাতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবু বকর সিদ্দীক, উমার ইবনু খাত্তাব, আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ,

আমর ইবনু আস, উসাইদ ইবনু হুযাইর ﷺ-এর মত প্রথম সারির সাহাবীরাও এই বাহিনীতে ছিলেন। এ ছিল ইসলামী রাষ্ট্রে যুবসমাজের মূল্যায়ন সম্পর্কে রসুল ﷺ-এর পরিপূর্ণ বিশ্বাস।

এখানে রয়েছে শাম ও ফিলিস্তিনের মুক্তির সংগ্রামে যুবসমাজের কর্তব্যের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত বিশ্বশক্তি দমনের সংগ্রামে যুবসমাজের কর্তব্যের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ। কারও অধিকার নেই যুবকদের ছোট করে দেখে নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবা ও শ্রেষ্ঠ দাবি করার। কেননা, যুবসমাজ নবী ﷺ-এর দৃষ্টিতে ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

রসুল ﷺ-এর ওয়াফাতের পর আবু বকর সিদ্দীক ﷺ এমন এক সিদ্ধান্ত নেন, যা ছিল মুসলমানদের ইতিহাসে সর্বাধিক দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত। তা হল রোমানদের বিরুদ্ধে উসামা ইবনু যায়দ ﷺ-এর বাহিনী প্রেরণের বিষয়টি কার্যকর করা। এই সিদ্ধান্ত দুঃসাহসিক হওয়ার পিছনে বেশকিছু কারণ আছে।

প্রথমত : এ সময়ে চতুর্দিক থেকে আরবদের ধর্মত্যাগের সংবাদ আসতে থাকে। যারা রসুল ﷺ-এর জীবনের শেষ দিকে ঈমান গ্রহণ করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। রসুল ﷺ-এর ওয়াফাতের সংবাদ পেয়ে তাদের অধিকাংশ মুরতাদ হয়ে আগের অবস্থানে ফিরে যায়। আরব উপদ্বীপে ধর্মত্যাগের এক উত্তাল তরঙ্গ বয়ে যায়। এমন সময় উসামা ইবনু যায়দ ﷺ-এর বাহিনীকে যাবতীয় সামরিক ব্যবস্থাপনা দিয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে পাঠানো ছিল একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। এতে মদীনা মুনাওয়ারা অরক্ষিত হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

দ্বিতীয়ত : এই বাহিনী তখন রোমান সাম্রাজ্যের মোকাবেলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছিল, যা ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ সামরিক শক্তির সাম্রাজ্য।

তৃতীয়ত : রসুল ﷺ-এর ওয়াফাতের পর মুসলমানরা ছিল মর্মাহত। এই বিরাট ধাক্কা তখনও কাটিয়ে ওঠা যায়নি। মুসলমানদের

ইতিহাসে হয়তো এটাই ছিল সবচেয়ে বড় মসীবত যে, শেষ নবীর ওয়াফাতের কারণে আসমানের সাথে যোগাযোগ শেষ হয়ে যায়।

এসবই ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবুও এ বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্তে আবু বকর সিদ্দীক ﷺ ছিলেন অনড়। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি বলেছিলেন তাঁর সেই অমর বাণী– যা তাঁর জীবনের মূলনীতিহিসাবে ব্যক্ত হয়– আল্লাহর কসম! যদি মদীনায় এসে কুকুররা উম্মাহাতুল মুমিনীন (নবী-পত্নীগণ)-এর পা টেনে নিতে থাকে, তবুও আমি সেই বাহিনী ফিরিয়ে নিব না, যা রসুলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা করিয়েছেন। সেই ঝাণ্ডা আমি নামিয়ে আনব না, যা তিনি উড্ডীন করেছেন।

অর্থাৎ যখন নবী ﷺ কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন যেকোনো অবস্থায় তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি যদি বিভিন্ন বিদ্রোহী দল আর কুকুররা মদীনার ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে এবং নবীপত্নীদের সম্মানহানি হতে থাকে, যাদের মধ্যে আয়েশা বিনতে আবু বকর ﷺ-ও রয়েছেন। তবুও তিনি সেই বাহিনী প্রেরণ করবেন, যা নবী ﷺ প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন। নবী ﷺ যে পতাকা বেঁধে গেছেন, সেটা তিনি কিছুতেই খুলবেন না। উসামা ইবনু যায়দ ﷺ-এর পরিবর্তে অন্যকাউকে সেনাপতি করার প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। নবীজী ﷺ-এর সিদ্ধান্তকেই তিনি নিজের সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করেন।

উসামা ইবনু যায়দ ﷺ-এর বাহিনী শাম অভিমুখে রওয়ানা হয়। সেখানে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। কিন্তু যে জনপদ দিয়েই এ বাহিনী অতিক্রম করে, সেখানকার অধিবাসীরা বলতে থাকে, নিশ্চয়ই এ বাহিনী এমন এক জাতির পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছে, যারা সত্যিই শক্তিশালী। যদি তারা দুর্বল হত, তা হলে রোমানদের বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ করত না।

এই বাহিনীর প্রেরণ অনেক ফলদায়ক প্রমাণিত হয়। উত্তর আরব উপদ্বীপের গোত্রগুলোর মধ্যে ধর্মত্যাগের ফেতনা নির্বাপিত হয়ে যায়। যাদের কাছ দিয়ে এই বাহিনী অতিবাহিত হয়, তারাই নীরব হয়ে যায়।

মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষতি সাধিত হয় না। এ ছিল প্রিয় নবী ﷺ-এর নির্দেশ অনুসরণের বরকত।

পুরো এক বছর চলতে থাকে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। হিজরী একাদশ সন এবং দ্বাদশ সনের শুরুর দিকে কয়েক মাস। আরব উপদ্বীপের বেশিরভাগ শক্তির সাথে এ সময় মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা হয়। এসব সংঘাতের সর্বশেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংঘাতটি হয়ে ইয়ামামার ময়দানে। ভণ্ড মুসাইলামাহর বিরুদ্ধে। আল্লাহর তলোয়ার খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﷺ-এর নেতৃত্বে এ যুদ্ধে ইসলামী বাহিনীর বিজয় ঘটে। এভাবে সব মুরতাদের বিরুদ্ধেই মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে। এক বছর পর আরব উপদ্বীপে ধর্মত্যাগের ফেতনা একেবারে শেষ হয়ে যায়।

এরপর আবু বকর সিদ্দীক ﷺ গ্রহণ করেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে দুঃসাহসী পদক্ষেপ। তা হল পারস্যের বিরুদ্ধে লড়াই এবং ইসলামী বিজয়াভিযানের সূচনা। পারসিক আর রোমানরা তৎকালীন দুনিয়াকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে রেখেছিল। এজন্য এটা ছিল এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত।

দ্বাদশ হিজরী সনে সত্যি সত্যি পারস্যের ভূখণ্ডে ইসলামী বিজয়াভিজান শুরু হয়। তখন ছিল খ্রিস্টীয় ৬৩২ সাল। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﷺ-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ইরাকের মাটিতে অর্জন করে অনেক বড় বড় বিজয়। মাত্র ১৭ মাসে তিনি প্রায় ১৫টি দুর্দান্ত যুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে নেন। এসময় খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﷺ-এর নেতৃত্বে ছিল ১৮ হাজারের বাহিনী। আর পারস্য বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল সর্বনিম্ন ষাট, সত্তুর, বা আশি হাজার। ফিরায রণাঙ্গণে পারসিকদের সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার। সবগুলো যুদ্ধেই মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে।

কিন্তু বড় আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে পারস্যের ভূখণ্ডে ইসলামী বাহিনীর যুদ্ধ চলাকালেই আবু বকর সিদ্দীক ﷺ শাম বিজয়ের জন্য রোমানদের বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। রসুল ﷺ-এর খলিফা আবু বকর ﷺ-এর যুগেই শুরু হয় ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডের সাথে খোলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস।

এ বিষয়টি শুরু হয় শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ ﵁-এর একটি স্বপ্নের মাধ্যমে। সেই স্বপ্ন বলছিল অচিরেই ইসলামী বাহিনী শাম বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে। বিষয়টি আবু বকর সিদ্দীক ﵁-এর ভাবনার সাথে মিলে যায়। তিনি তখনই শামের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করা এবং রোমানদের সাথে লড়াইয়ে অবতরণের কথা ভাবছিলেন, যখন তিনি পারসিক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন।

চিন্তা করে দেখুন, একটি সদ্য গঠিত ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে দুটি সামরিক শক্তির সাথে যুদ্ধ করবে! তাও আবার একই সাথে। আবু বকর সিদ্দীক ﵁ এমনই পরিকল্পনা করছিলেন। শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ ﵁-এর স্বপ্ন থেকেও তিনি সুসংবাদ গ্রহণ করেন। তবে এতটুকুর উপর ক্ষান্ত না হয়ে বিষয়টি নিয়ে তিনি মুসলমানদের পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এটা ছিল এক দুঃসাহসিক পরামর্শ সভা। দিনটি ছিল ৩০ রবিউল আউয়াল, ১২ হিজরী, মুতাবিক ১৪ জুন, ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ। এ সভায় আবু বকর সিদ্দীক ﵁ মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে শাম জয় করার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। নেতৃবর্গ সবাই এ অভিযানের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন।

আবু বকর সিদ্দীক ﵁ তখন থেকে শামের ভূখণ্ডে রোমানদের সাথে লড়াইয়ের জন্য সৈন্য সংগ্রহ শুরু করেন। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এ ছিল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান। এজন্য তিনি মুসলমানদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে উৎসাহ দিতে থাকেন। তার আহ্বানে সবার আগে সাড়া দেন খালিদ ইবনু সাঈদ উমাবী ﵁। আবু বকর সিদ্দীক ﵁ তাঁকে একটি ক্ষুদ্র মুজাহিদ ইউনিটের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। এ ইউনিটকে তিনি বিশাল বাহিনী গড়ে ওঠার আগ পর্যন্ত রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা ও তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেন।

এক পর্যায়ে শামের ভূখণ্ডে রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মুসলিম মুজাহিদদের সমন্বয়ে চারটি পূর্ণ বাহিনী প্রস্তুত হয়। উল্লেখ্য, তৎকালীন ফিলিস্তিনও ছিল শামের অন্তর্ভুক্ত। এ চারটি মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে সর্ব প্রথম রওয়ানা হয় ইয়াযিদ ইবনু আবু সুফইয়ান ﵁-এর বাহিনী।